ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ।। ৭ আষাঢ়, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২২ জুন, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

বিপদের আশঙ্কায় চীন সীমান্তে সেনা বাড়াচ্ছে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চীনের সামরিক তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত অরুণাচলের চীন সীমান্ত বরাবর সৈন্য সংখ্যা বাড়াচ্ছে। সেইসঙ্গে যুদ্ধের সাজসরঞ্জামও মজুত করছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্র অনুসারে ২৫ থেকে ৩০ হাজারের দুই ডিভিসন সেনা চীন সীমান্ত বরাবর মোতায়েন করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অরুণাচলের সামরিক বিমানঘাঁটিতে এক স্কোয়াড্রন সুখোই (৫৪-৩০) বিমান মজুত রাখা হচ্ছে। এ ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান বিমানঘাঁটিতে প্রস্তুত রাখা হবে এম কে আই কমব্যাট জেটবিমানও। চীনা সামরিক বাহিনী এবং চীনা যুদ্ধ বিমানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্যেও এবার ভারতীয় বাহিনীর হয়ে নজরদারির কাজ করবে বিশেষ ধরনের উন্নত প্রযুক্তির এয়ারব্রন ওয়ার্নিং অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম----যন্ত্রচালিত স্বয়ংক্রিয় বিমান।

উল্লেখ্য, ইউ পি এ সরকারের আমলে (২০০৮) অরুণাচলে কমপক্ষে পঞ্চাশবার চীনা ফৌজ ঢুকেছিল বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটা নিরামিষ বিবৃতি দেওয়া এবং তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী প্রণববাবুর চীন সফর ছাড়া কোনও কাজের কাজ হয়নি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে এন ডি এ সরকারের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্ণান্ডেজ চীনকে ভারতের পক্ষে সব থেকে বড় বিপদ বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মন্তব্যের বাস্তবতা ২০০৮ সালেই প্রমাণিত হয়। সেই বছরই চীন ভারতের অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলা সহ আরও ৯০ হাজার বর্গ কিলোমিটার নিজেদের অংশ বলে দাবী করে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির চীন সফরে জটিলতা কাটেনি। ১৯৬২ সালে চীন আক্রমণ করে ভারতের এক বিশাল অংশ ইতিমধ্যেই অধিকার করে বসে আছে। বিগত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের বড় সমর্থক ছিল সি পি এম। ১৯৬২ সালে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসী সরকার যুদ্ধে হেরে ভারতের বিশাল এলাকা একপ্রকার চীনের হাতেই তুলে দেয় বললে ভুল হবে না। আর সিপিএম তো চীনের পরিবর্তে ভারতকেই আক্রমণকারী বলে অভিহিত করে। এখনও সিপিএম নেতৃত্বের সেই মনোভাবের কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি।

সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের কথায় চীন ভারতের সীমানা বরাবর যে ধরনের উন্নতমানের রাস্তাঘাট ও রেললাইন তৈরি করেছে তাকে অবজ্ঞা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বলাবাহুল্য, চীন গত কয়েক বছর ধরেই সীমান্ত বরাবর দ্রুত সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধাস্ত্র যোগান দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা পাকা করেছে। চতুর্দশ লোকসভার অরুণাচলের সাংসদ (বিজেপি) কিরেণ রিজিজু এ বিষয়ে সংসদে বারবার ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিব্বতের মতো বাফার-জোন দখল করার পর চীন থেকে তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত রেল লাইন বসিয়েছে। এই সবকিছুরই লক্ষ্য কিন্তু ভারত।

ভারত-চীন সীমান্ত বিতর্ক জিইয়ে রেখেছে চীন। তারাও আরও এগিয়ে আসতে চায়। এক্ষেত্রে চীনের ব্যাপারটা খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। সম্পর্কের উষ্ণতা বৃদ্ধি, যৌথ সামরিক অভ্যাস যাই হোক না কেন, 'চীনা' মনোভাবকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে। যদিও মনমোহন সরকার প্রাক্তন সেনাপ্রধান ও বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল জেনারেল জে জে সিং-এর মাধ্যমে কথাবার্তা বলে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করতে চায়।

গত ৯ জুন জেনারেল জে জে সিং ইটানগরে বলেছেন, সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা মাথায় রেখেই চীন সীমান্তে ভারতের সেনা সংখ্যা বাড়ানো দরকার। তিনি আরও

(এরপর ১৩ পাতায়)

পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটিগুলি প্রস্তুত রাখছে বায়ুসেনা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। চীনই এখন দেশের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ। এই সারসত্য বুঝে পশ্চিমবঙ্গে পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটি বা এয়ারট্রিপগুলিকে ফের চালু করতে চলেছে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। কারণ, সিকিম, দার্জিলিং এবং অরুণাচল থেকে চীন সীমান্ত সামান্য দূরে। মাওবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর নেপালও এখন চীনের অঙ্গুলি হেলনে কাজ করছে। সেই কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজ্যের যে সমস্ত এয়ারট্রিপ আর ব্যবহার হয়নি সেগুলির পুনরুজ্জীবন শুরু হচ্ছে। সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও বায়ুসেনার সর্বাধুনিক যুদ্ধবিমান বাহিনী সুখোই-৩০ বিমানের স্কোয়াড্রন বসানো হচ্ছে। চীন সীমান্তের এত কাছাকাছি এতদিন সুখোই-৩০

বিমান মোতায়েন করা হয়নি। আকাশযুদ্ধে ঘাতক বলে পরিচিত সুখোই বিমানের এতটা ফরোয়ার্ড পোস্টিং-ই বলে দিচ্ছে চীন ভারতের কাছে কতটা বিপজ্জনক। সরকারি সূত্রে জানা যাচ্ছে, জলপাইগুড়ির হাসিমারাতে সুখোই বিমানের স্কোয়াড্রন স্থায়ীভাবে রাখা হবে। হাসিমারা বিমানঘাঁটি কৌশলগত দিক দিয়ে চীনের ভীষণ কাছে। ওদিকে অসমে তেজপুরেও সুখোই বিমান রাখা হচ্ছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় সারির বিমানঘাঁটি হিসাবে পানাগড়কে গড়ে তোলা হচ্ছে। পানাগড় থেকে যাতে আকাশে যুদ্ধবিমানের জ্বালানি ভরে দেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আকাশ পথের দূরত্বে হাসিমারা পানাগড় খুব বেশি দূর নয়। এ ছাড়া বীরভূমের রামপুরহাটের কাছে সুঁড়িচোরা এয়ারট্রিপটি নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। কোচবিহার বিমানবন্দরও আপদকালীন ভিত্তিতে ব্যবহার উপযোগী হিসাবে গড়ে তুলছে বিমান চলাচল মন্ত্রক। এক সরকারি মুখপত্রের কথায়, চীনের সঙ্গে যুদ্ধ হলে পশ্চিমবঙ্গের মাটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হবে। তাই আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে ভারত।

পুরভোটেও ধাক্কা খাবে বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি।। তিন বছর আগেও এরাজ্যের নির্বাচনী পরিস্থিতিটা ছিল আলাদা। আলিমুদ্দিনের আকাশে অনেক মেঘ। লোকসভা থেকে আয়লা, তাড়া করে বেড়াচ্ছে বামপন্থীদের। এরই মাঝে আর এক নির্বাচনের মুখোমুখি ব্রান্ড বুদ্ধ। পৌরসভার ভোট। এখনও লোকসভার ক্ষত সারেনি। ২৮ জুন রাজ্যের ১৬টি পৌরসভার ভোট। এর মধ্যে ১১টি রয়েছে ফ্রন্টের দখলে। অন্যদিকে নবগঠিত ডানকুনির নির্বাচন এই প্রথম। এখন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ সহ আরও ১৬টি পৌরসভার নির্বাচন। এগুলি হল উত্তরবঙ্গের মাল, ইসলামপুর, কালিয়াগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে রয়েছে আসানসোল, মধ্যমগ্রাম, রাজারহাট- গোপালপুর, দমদম, দক্ষিণ দমদম, মহেশতলা, রাজপুর-সোনারপুর, উলুবেড়িয়া, এগরা, কুলটি, সাঁইথিয়া, সদ্যগঠিত ডানকুনি। পাহাড়ের তিনটি পৌরসভা জি এন এল এফের দখলে।

(এরপর ১৩ পাতায়)

আসন্ন পুরসভা ভোট যেখানে

দক্ষিণবঙ্গ পুরসভা	কার দখলে
আসানসোল	বামফ্রন্ট
মধ্যমগ্রাম	বামফ্রন্ট
রাজার-গোপালপুর	বামফ্রন্ট
দমদম	বামফ্রন্ট
দক্ষিণ দমদম	বামফ্রন্ট
মহেশতলা	বামফ্রন্ট
রাজপুর-সোনারপুর	বামফ্রন্ট
উলুবেড়িয়া	বামফ্রন্ট
এগরা	তৃণমূল কংগ্রেস
কুলটি	তৃণমূল জোট
সাঁইথিয়া	কংগ্রেস
ডানকুনি	নবগঠিত
উত্তরবঙ্গ	
মাল	বামফ্রন্ট
ইসলামপুর	বামফ্রন্ট
কালিয়াগঞ্জ	কংগ্রেস
গঙ্গারামপুর	বামফ্রন্ট

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

বন্ধ হচ্ছে একের পর এক বাংলা টিভি চ্যানেল

গূঢ়পুরুষ।। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের মিডিয়া জগতেও একটা বড়সড় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এই পরিবর্তন বা অধঃপতন স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে রাজ্যের টিভি সংবাদ চ্যানেলে। লোকসভার নির্বাচনের আগে থেকেই বাংলা বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম সি পি এম অথবা তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাম্পে যোগ দিয়ে সরাসরি একপেশে দলীয় প্রচারে নেমে পড়েছিল। সংবাদ মাধ্যমের নিরপেক্ষ ভূমিকা, নীতিবোধ— সবই তারা বিসর্জন দিয়েছিল। নীট ফল, দর্শক-শ্রোতারা এবং বিজ্ঞাপনদাতারা নিঃশব্দে তাদের বয়কট করেছে। তাই একের পর এক টিভি চ্যানেল এখন দরজা বন্ধ করছে।

এই হিট লিস্টে এক নম্বর নাম, কলকাতা টিভি। গত ৮ মে লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরুতেই কলকাতা টিভি-র সংবাদ সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। আজ থেকে তিন বছর আগে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে বিপুলভাবে সাড়া জাগিয়ে 'কলকাতা টিভি' তার সংবাদ প্রচার শুরু করে। শুরুতে এই বাংলা সংবাদ চ্যানেলের তিন প্রধান কর্তা ছিলেন সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায়, তথাগত দত্ত এবং শান্তনু ঘোষ। অঙ্গীকার ছিল, দর্শকদের সঙ্গে কলকাতা টিভি 'রাতদিন সাতদিন' থাকবে। যাকে সংক্ষেপে বলা হয় ২৪ X ৭। বছর ঘরতে না ঘুরতেই তিন কর্তার মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বখরা নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। প্রথমে সুমন চট্টোপাধ্যায় ও পরে শান্তনু ঘোষ কলকাতা টিভি ছেড়ে চলে যান। এই দুই কর্তা চলে যাবার পর তথাগতবাবু একক প্রচেষ্টায় এই চ্যানেলটি চালাতে থাকেন। প্রথম থেকেই চ্যানেলটি ক্ষমতাসীন সি পি এম দলের চক্ষুশূল ছিল। এর অনেক কারণের মধ্যে একটি ছিল পার্টির নিজস্ব সংবাদ চ্যানেল '২৪ ঘন্টা' ও 'আকাশ বাংলা'-কে রক্ষা করা। প্রতিযোগিতা থেকে 'কলকাতা টিভি' চ্যানেলকে হটিয়ে দেওয়া। প্রথমদিকে আলিমুদ্দিনের নেতারা বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। কারণ, কলকাতা টিভি-র এক

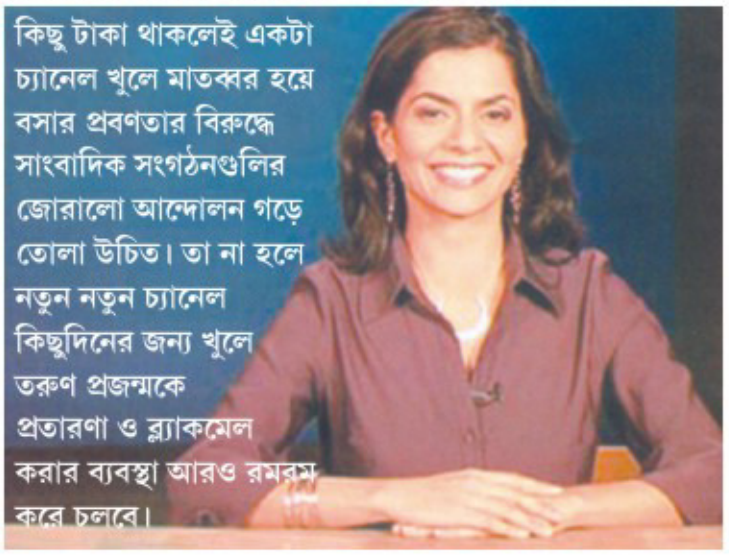

নম্বর মুরুব্বি ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি। প্রথমে দুই কর্তা ও পরে প্রধান মুরুব্বির বিদায়ের পর কলকাতা টিভি আক্ষরিক ভাবে অনাথ হয়ে পড়ে।

চলতি বছরের শুরুতেই কলকাতা টিভি-র পরিচালকরা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হন এই আশায় যে, তিনি চ্যানেলটিকে বাঁচার অক্সিজেন যোগাবেন। এই আশার কারণও ছিল। কলকাতা টিভি প্রথম থেকেই নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর আন্দোলনে মমতাকে মধ্যমণি করে জোরদার প্রচার চালায়। এই চ্যানেলের মালিক তথাগতবাবুর আশা ছিল যে, তৃণমূল নেত্রী প্রতিদানে কোনও বড় ব্যবসায়ীকে ধরে মোটা টাকা লগ্নী করানোর ব্যবস্থা করবেন। প্রথমদিকে নেত্রী গররাজিও ছিলেন না। কবীর সুমনকে সামনে রেখে কলকাতা টিভিকে তৃণমূলের নিজস্ব সংবাদ চ্যানেলের কথা তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের আগেই কলকাতা টিভি-র ৩২০ জন সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মীরা টানা পাঁচমাস বেতন না পাওয়ার প্রতিবাদে কর্মবিরতি আন্দোলন শুরু করে দেন। বন্ধ হয়ে যায় এই চ্যানেলের সংবাদ সম্প্রচার। বিরক্ত মমতা মুখ ফিরিয়ে নেন। এখন কলকাতা টিভি তার অস্তিত্বটুকু বাঁচাতে

(এরপর ১৩ পাতায়)

সরকারি উদাসীনতায় ধুঁকছে ব্যারাকপুরের সবকটি টোল

অনুপ নাথ, ব্যারাকপুর ।। এক সময় সংস্কৃত চর্চার অন্যতম পীঠস্থান ছিল উত্তর ২৪ পরগণার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের ভাটপাড়া, শ্যামনগর, হালিশহর, ইছাপুর, ব্যারাপকুর ও বরানগর, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হুগলী এবং ভিনরাজ্য থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আসতেন টোলগুলিতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য। তবে আজ সবই বিস্মৃতির অতলে। সরকারি উদাসীনতায় বন্ধ হয়ে গেছে একাধিক টোল। ব্যারাকপুরের মান্নানপাড়ার শিবচতুষ্পাঠী ও মণিরামপুর চতুষ্পাঠী, খড়দহ রহড়ার বসন্ত চতুষ্পাঠী, ইছাপুর নবাবগঞ্জের চিত্রা সুন্দরী চতুষ্পাঠী ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, শ্যামনগরের মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ, প্রাচ্যবিদ্যা নিকেতন ও তারাসুন্দরী চতুষ্পাঠী, ভাট-পাড়ার প্রাচীন আবাসিক সংস্কৃত কলেজ, জগদ্দলের শ্যামরায় চতুষ্পাঠীর মতো অনেক টোল অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের বঙ্গীয় শিক্ষা পর্ষদের এক্তিয়ারভুক্ত ভাটপাড়ার 'অন্নদা সার্বভৌম চতুষ্পাঠী', শ্যামনগরের 'উত্তর প্রান্তিক সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার সংস্থান', হালিশহরের নিগমানন্দ সারস্বত মঠ ও বেলঘরিয়ার গুরুদাস চতুষ্পাঠীর মতো বেশ কিছু টোল ধুঁকছে। সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের ব্যাকরণ, পৌরোহিত্য, স্মৃতি, কাব্য, জ্যোতিষ, ন্যায়, পুরাণ, সাংখ্য প্রভৃতি বিষয়ের ওপর শিক্ষাদান করা হয় টিকে থাকা টোলগুলিতে। এমনকী প্রতিবছর পর্ষদের অধীনে আদ্য, মধ্য, উপাধি--এই তিনটি স্তরের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। ধুঁকতে থাকা টোলগুলির অধ্যক্ষদের অভিযোগ, টোলগুলিকে টিকিয়ে রাখতে বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা নেই রাজ্য সরকারের। অধ্যক্ষেরা মহার্ঘভাতা ছাড়া আর কিছুই পান না।

শ্যামনগরের উত্তর প্রান্তিক সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার সংস্থানের অধ্যক্ষ সোমনাথ শাস্ত্রী জানান, পরিকাঠামো উন্নয়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত শিক্ষা সংস্থানের 'নন ফরমাল এডুকেশন কোর্স', হিসাবে যদি টোলগুলিকে অনুদান দেন, তাহলে সংস্কৃত চর্চার প্রাণকেন্দ্রগুলি তাদের পুরোনো গরিমা ফিরে পাবে। এদিকে সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে বঙ্গীয় শিক্ষা পর্ষদের কার্যকরী কমিটির সদস্য সুরেশ ব্যানার্জী জানান, এতদিন কোনও স্থায়ী কমিটি ছিল না, সম্প্রতি গঠিত হয়েছে। মন্ত্রী পার্থ দে-র সঙ্গে আলোচনা চলছে টোলগুলির আধুনিকীকরণের। তিনি আরও জানিয়েছেন, বহু টোল অধ্যক্ষের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে নতুন করে অধ্যক্ষ নিয়োগের চিন্তাভাবনা চলছে। তাছাড়া আরও বেশ কয়েকটি টোলের অধ্যক্ষেরা সরকারি ভাতা থেকে বঞ্চিত। সেগুলোর দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। নতুন কমিটি কিছুটা উদ্যোগী হয়েছে। সংস্কৃতের পাশাপাশি মডার্ন বিষয়গুলি টোলগুলিতে যাতে পড়ানো যায়, তার চেষ্টা চলছে।

জামালপুরে পুণ্যার্থীদের ওপর হামলা

সংবাদদাতা।। ৭ জুন রবিবার বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার জামালপুরে বাবা ''বুড়োরাজ'' (শিবঠাকুর)-এর মন্দিরে পুজো দিতে আসা নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার এবং কাটোয়া এলাকার ধর্মপ্রাণ নিরীহ হিন্দু ভক্তদের ওপর একদল মুসলিম দুষ্কৃতী পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায়। উচ্ছৃঙ্খল কিছু স্থানীয় যুবকদের ইন্ধনে ওই মুসলিম দুষ্কৃতীদের সাংঘাতিক আক্রমণে নৃশংসভাবে তিনজন হিন্দুকে ছাতনীর মোড়ে পিটিয়ে মারা হয়। সেইসঙ্গে গড়পগাছা গ্রামে এবং পাটুলি স্টেশনে হিন্দু যাত্রীদের ওপরেও মুসলিম দুষ্কৃতীরা নৃশংস হামলা চালায়। পুলিশের সহযোগিতাতেই এই নারকীয় আক্রমণ সম্ভব হয়েছে। তারাও হিন্দু যাত্রীদের লাঠিচার্জ করেছে।

অভিযোগ—এই হামলার নেতৃত্ব দেয় ছাতনী নিবাসী—১। উদয় ঘোষ, ২। দেবু পালিত, ৩। লাল্টু হাজরা, ৪। বিল্টু ঘোষ, ৫। নিমাই পণ্ডিত, ৬। সজল বিশ্বাস, ৭। অনুপম ঘোষ, ৮। শীতল বিশ্বাস, ৯। দুলাল বিশ্বাস, ১০। সত্তর আলি শেখ, ১১। জহুর আলি শেখ, ১২। হাফিজুল শেখ, ১৩। আনোয়ার শেখ, ১৪। আসরা শেখ, ১৫। সামাহ শেখ, ১৬। মুর্শেদ শেখ, ১৭। রহিত আলি শেখ।

স্থানীয় মানুষ চাপা ক্ষোভ ও উত্তেজনায় ফুঁসছে।

এই সময়

জন্মদিন

জন্মদিনকেও রাজনীতি থেকে বাদ রাখছে না কংগ্রেস। তার ওপর রাহুল গাঁন্ধীর জন্মদিন বলে কথা। ১৯ জুন তাঁরই জন্মদিনে উত্তরপ্রদেশে অঘোষিত রাজনৈতিক কর্মসূচী। স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এদিন সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেছে, যাতে উপস্থিত থাকছেন রাহুল। উদ্দেশ্য দলিতদের কাছে টানা। দরিদ্র নারায়ণের সেবা। কিন্তু আসল লক্ষ্য দলিতভোট ব্যাঙ্ক মজুত করা। সামনেই বিধানসভার ভোট।

বিতর্কের গুরু

বির্তক পিছু ছাড়ছে না তাঁর। আয়লা হোক, কিংবা হিঙ্গলগঞ্জ। ১৪ জুন বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের হিঙ্গলগঞ্জ যাওয়া নিয়েও বিতর্ক বেধেছে রাজ্য-রাজনীতিতে। অটোয় চেপে হিঙ্গলগঞ্জ যান মুখ্যমন্ত্রী। এতেই প্রশ্ন উঠেছে একাধিক। যে রাস্তায় পুলিশের জিপ যেতে পারে, ট্যাক্সি চলতে পারে সেখানে অটো কেন! স্ট্যান্ট? সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা? ইতিপূর্বেই একশ্রেণীর সংবাদ মাধ্যম বুদ্ধদেবের কাজের সমালোচনা করেছে।

সতর্কতা

শুধু আয়লা নয়, সুন্দরবনকে বাঁচাতে প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা। সম্প্রতি 'নেচার এনভায়রণমেন্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটি' এমনই ইঙ্গিত দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিপর্যয় প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে হারিয়ে যেতে পারে সুন্দরবন। বায়ুর নিম্নচাপজনিত বিভিন্ন প্রকারের ঝড় আবারও সুন্দরবনের ওপর আঘাত হানতে পারে। সোসাইটি সরকারকে সুন্দরবন বাঁচাতে বিভিন্ন গাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়েছে। সঙ্গে বাঁধগুলি উঁচু করারও পরামর্শ দিয়েছে সোসাইটি।

শোভারাজ

নেপালের রাজনৈতিক পালা-বদলের ফায়দা তুলতে চাইছে চার্লস শোভারাজ। ক্ষমতাসীন দলগুলির আইনজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চাইছেন তিনি। বিকিনী কিলার নামে কুখ্যাত এই অপরাধী নেপালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে ভুগছেন। তিন দশক আগে এক আমেরিকার পর্যটককে খুন করেন তিনি। এরই মধ্যে নকল পাসপোর্টের মামলাও যুক্ত হয়েছে তার বিরুদ্ধে। শোভারাজ আইনজীবীদের ধরে বাইরে বেরিয়ে আসতে মরিয়া। যা নেপালের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক।

সংবাদমাধ্যম

মিডিয়ার কাছে এখন হট ইস্যু বিজেপির যশবন্ত সিন্‌হা। ১৪ জুন তাঁর সহ-সভাপতির পদ থেকে ইস্তফাকে সংবাদ মাধ্যম ইতিমধ্যেই রং মেশাতে লেগেছে। বেশ কিছু মিডিয়ার নাকি এতে টি আর পি-ও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিজেপির শিবিরে চিত্রটা আলাদা। যশবন্ত সিন্‌হা নিজেই ওদিন স্পষ্ট জানিয়েছেন, আমার পদত্যাগ গৃহীত হওয়াতে আমি খুশি। তিনি যে দল ছাড়ছেন না এদিন তিনি তাও মিডিয়ার সামনে স্পষ্ট করে দেন। অথচ বাজারি সংবাদমাধ্যম তাঁর পদত্যাগের খবরে রং মেশাচ্ছে। মনগড়া কড়া গল্পও তৈরি করছে।

অফিসে অস্ত্রাগার

পার্টি অফিসে অস্ত্র কেন? প্রশ্নটা শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে নয়। প্রশ্ন উঠেছে বামফ্রন্টের শরিক আর এস পি'র মধ্যেও। ১৩ জুন পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়ির অফিসে জেলা বামফ্রন্টের বৈঠকে এই প্রশ্ন তুলেছেন আর এস পি নেতারা। তাদের প্রশ্ন খেজুরির অফিস রাতারাতি অস্ত্র ভাণ্ডার হল কেন? প্রশ্নের জ্বালায় চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে যান সিপিএমের জেলা সভাপতি কানু সাহু। জেলা আর এস পি নেতৃত্বও সিপিএম-কেই-এর জন্য দায়ী করছে।

ও ডাক্তার...

থার্ড জেনারেশন কি নিজেদের ডাক্তার হিসাবে দেখতে চায় না! প্রশ্নটা দু'দিন আগেও উঠত না। যদি না পি.সি.পি.এম.টি পরীক্ষার বেহাল চিত্রটা সামনে আসত। কেন্দ্রীয় স্তরে গৃহীত এই ডাক্তারি পরীক্ষায় ১৯৭ জন পরীক্ষাই দিলেন না। উপস্থিত ছিলেন না পরীক্ষার হলে। ১০২৩ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় বসেন। অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ খোদ দিল্লীর। তাদের সংখ্যা ১০৬ জন। এরপরের বড় অংশটা রাজস্থানের। 'পি সি পি এম টি' পরীক্ষায় এইভাবে ছাত্রী-ছাত্রীদের উপস্থিত না হওয়াটাও রীতিমতো চিন্তার। তাহলে কি থ্রি জি চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে সরে আসছে।

তাঁর পথেই

সদ্য স্পিকার পদে শপথ নেওয়া মীরাকুমারকে তাঁর পথই অনুসরণ করতে বললেন প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি মীরাদেবীকে দলত্যাগ করতে বলেছেন, যাতে স্পিকার পদে থেকে দলীয় বিতর্কগুলিকে এড়ানো যায়। প্রসঙ্গত, সোমনাথবাবু বরাবরই বিশ্বাস করতেন, স্পিকার পদকে সবসময় দলের ঊর্ধে রাখা উচিত। সেই কারণে পরমাণু চুক্তি নিয়ে দলের বিরুদ্ধে অবস্থান করে পার্টি নেতৃত্বের বিরাজভাজন হন। তাঁকে পার্টি থেকে বহিস্কৃত হতে হয়। কিন্তু মীরাদেবী তাঁর কথা শুনলে হয়।

লোকসান

খেজুরি, লালগড়ের মতো ঘটনা চিন্তার ছাপ ফেলেছে বাণিজ্যিক মহলেও। বাণিজ্যিক গোষ্ঠীও এই ঘটনায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন। লোকসানের আশঙ্কায় অনেকেই বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চাইছেন না।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজ্য সরকারের সর্বদলীয় বৈঠক

আয়লা ত্রাণকে উদ্দেশ্য করিয়া বামপন্থীরা পুনরায় কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে ফাটল ধরাইতে সক্ষম হইয়াছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুঙ্কার ছাড়িয়াছেন যে এই অপদার্থ ও দুর্নীতিগ্রস্থ বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করিবার কোনও প্রশ্নই উঠে না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া হাজার হাজার কোটি টাকার কোনও হিসাব এই সরকার দিতে অপারগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই সরকারের পুঁজি। বছর বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হউক এই সরকার তাহাই কামনা করে। তাই বছরের পর বছর এই রাজ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ লাগিয়াই থাকে। স্থায়ীভাবে নদী-খাল-বিল সংস্কার এই রাজ্যে করা হয় না, দীর্ঘস্থায়ী মজবুত বাঁধ নির্মাণ এই রাজ্যে হয় না; বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী সমাধানের কোনও সঠিক উদ্যোগও নাই। দুর্যোগ মোকাবিলার কোনও কার্যকরী বাহিনী আজও এই রাজ্যে গঠিত হয় নাই।

তৃণমূল কংগ্রেস তাই সঠিকভাবেই এই আশঙ্কা য় আশঙ্কি ত যে পুনরায় তাহাদের দাবীমতো হাজার কোটি টাকা এই দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারের হাতে দিলে তাহা দুর্গত মানুষদের মধ্যে বন্টিত হইবে না। এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় এই রাজ্যের মানুষ তাহা বিলক্ষণ জানে। জানে বলিয়াই দুর্গত মানুষের নিকট হইতে সঠিক ব্যবহারই মুখ্যমন্ত্রী পাইয়াছেন। বাঁধ মেরামতি তো দূর অস্ত, গৃহহীন মানুষদের গৃহ নির্মাণ তো দূরের কথা, সামান্য পানীয় জলটুকুও পর্যন্ত দুর্গতদের কাছে পৌঁছাইতে পারে নাই এই রাজ্য সরকার। কিন্তু শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়, এই সরকার তড়িঘড়ি হিসাব করিয়া ফেলিয়াছে কত লক্ষ মুরগী মারা গিয়াছে, কত লক্ষ হাঁস মারা গিয়াছে, কত লক্ষ গরু মারা গিয়াছে, কত লক্ষ ছাগল মারা গিয়াছে, কত লক্ষ ধান নষ্ট হইয়াছে। কত লক্ষ একর আলু ক্ষেতেনষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর সেই হিসাব এতটাই নিখুঁত যে এই ক্ষয়ক্ষতির জন্য রাজ্য সরকার ঠিক গুণিয়া গুণিয়া এক হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করিয়াছে। যে সরকার দুর্গত এলাকায় দশ দিনের মধ্যেও পৌঁছাইতে পারে নাই, সেই সরকারের এই হিসাব বা দাবী কতটা ন্যায় সঙ্গত তাহা অবশ্যই বিতর্কের বিষয়।

লোকসভা নির্বাচনে পর্যুদস্ত ও আয়লায় বিপর্যস্ত অপদার্থ সিপিএম নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার এখন সর্বদলীয় বৈঠক ডাকিয়াছে। কেন এই বৈঠক? কি তাহার উদ্দেশ্য? লক্ষ্যই বা কী? বিপদে পড়িলে সকলকে জড়াইব আর সময় বুঝিয়া পুলিশ ও সশস্ত্র ক্যাডার লেলাইয়া বিরোধীদের ঠান্ডা করিব — এ কেমন ন্যায়ের শাসন পদ্ধতি? সরকারের অর্থ, লোকবল, রাজ্য কর্মচারী আছে। সরকারের উচিত তাহা লইয়া কাজে নামিয়া পড়া, না আরও বৈঠক করা? এও এক 'কামিয়েনিস' রাজনীতি। এই সর্বদলীয় বৈঠক এক রাজনৈতিক বৈঠক। এই বৈঠককে কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেস পুনরায় বামপন্থীদের নিকটস্থ হইবার ফিকির খুঁজিতেছে। বামপন্থীরা এমন পদক্ষেপে সফলও হইয়াছে। কংগ্রেস তৃণমূল মধু চন্দ্রিমায় কিঞ্চি ৎ ফাটলও ধরিয়াছে, হয়ত মধুচন্দ্রিমায় মগ্ন থাকায় এখনই যেভাবে ফোঁস করিয়া ওঠে নাই নববধূ। তবে কংগ্রেস যেভাবে তাহার পুরানো প্রেমিকার এক ডাকে দৌড় দিয়াছে তাহাতে অনেক প্রশ্ন মনে আজ না হোক কাল জাগিবেই।

কমিউনিস্টদের যেমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, তৃণমূল নেত্রীরও একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। কংগ্রেস তাহা বিলক্ষণ জানে। এই কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীই একদিন "নয়া শিল্পনীতি" ও "নয়া আর্থিক নীতি"র ভড়ং করিয়া ডব্লু-টি-ও নামক খাল কাটিয়া মার্কিন ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের দেশে প্রবেশ করাইয়াছে। স্বদেশী অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির বাজারে পরিণত করিয়াছে। আজ আবার দুই শতের বেশি আসন পাওয়ায় দেশি-বিদেশি পুঁজিবাদীরা এই সরকারের কাছে নানান দাবী পেশ করিয়াছে। তাহারা যেমন উল্লসিত, প্রধানমন্ত্রীও সমান উল্লসিত। তাহার উল্লাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রয় করিয়া প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা জোগাড় করিবার ফিকির করিতেছে যাহাতে এই বিপুল অর্থ দেশি-বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে শিল্প গড়ার নামে অর্পণ করা যায়। শিল্পের নামে শিল্পপতিদের নানান কর ছাড়ের কথা প্রায়শই শোনা যাইতেছে। পেট্রলিয়ামজাত দ্রব্যের উপর হইতে ভর্তুকি তুলিয়া লইবার কথাও শোনা যাইতেছে। এই সবের ফল যে জনঅসন্তোষ একথা কংগ্রেসও জানে, তৃণমূল কংগ্রেসও জানে। কংগ্রেস একথাও জানে যে তৃণমূল কংগ্রেস ইউপিএ সরকারের এই ভুতের বোঝা বহিবার পাত্র নহে। কারণ তাহাকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই কমিউনিস্টদের মোকাবিলা করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এইসব কু-কাজের ভাগী যে তাহারা বরদাস্ত করিবে না কংগ্রেস তাহা বিলক্ষণ জানে। ইতিমধ্যেই মমতা ও করুণানিধির কন্যা (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) ঢালাও বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে মুখ খুলিয়াছে। কারণ নেভেলী লিগনাইট কর্পোরেশন তো তাহারই রাজ্যের।

ঢালাও কর্মচ্যুতি, বিলগ্নীকরণ, পেট্রল ডিজেলের দরবৃদ্ধি ইত্যাদি তৃণমূল মানিতে পারিবে না। তাই কংগ্রেসের এই বামপ্রীতি। এখনও সংসদে বামপন্থীদের রহিয়াছে চবিবশটি আসন। তৃণমূল ও ডিএমকে সমর্থন প্রত্যাহার করিলে বামপন্থীরা তাহাদের চোখের মণি হইয়া উঠিতেই পারে। তাহারই প্রস্তুতি কী এই সর্বদলীয় বৈঠকে কংগ্রেসীদের উপস্থিতির মূল কারণ? ভবিষ্যৎই বলিতে পারে।

প্রকৃতি-ই কম্যুনিস্ট দের সহ্য করতে পারবে না

অরবিন্দ ঘোষ

কেবল পশ্চিমবঙ্গ বা কেরল থেকেই নয়, কম্যুনিজম ও কম্যুনিস্টরা সারা পৃথিবী থেকেই নিশ্চি হ্ন হতে চলেছে। মমতা ব্যানার্জীর নিশ্চ য়ই শ্লাঘার পাত্রী — পশ্চিমবঙ্গে যে ভাবে তিনি কম্যুনিস্ট নিধন যজ্ঞের পৌরোহিত্য করেছেন। কিন্তু এই ব্যাপক হারে কম্যুনিস্ট নিধন যজ্ঞ আর কোথাও হয়েছে কী এর আগে? ইতিহাস কী বলে?

ইতিহাস কী বলে জানার আকাঙ্ক্ষা নেই। কারণ এই প্রতিবেদক ১৯৯১ সালে প্রায় মাসখানেক মস্কোতে বসে দেখেছেন কেমন করে স্ট্যালিন-এর খুন জখমের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিজম একরকম বিনা রক্তপাতে রাশিয়া (বা সোভিয়েত ইউনিয়ন) থেকে বাষ্পের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাত্র ২৮-২৯ বছর আগেকার কথা। আমি তখন নতুন দিল্লীর 'হিন্দুস্তান টাইমস্' কাগজের বিশেষ প্রতিনিধি। আগস্ট মাসের শেষের দিকে দুটো ক্যু (বিদ্রোহের)-র ফলে গোর্বাচেভ-এর নেতৃত্বে যে কম্যুনিজম টিকে ছিল, তাসের ঘরের মতো সমস্ত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। আমার সম্পাদক শ্রী দুআ (Dua) আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভ ব মস্কো যেতে আদেশ করলেন।

আগেকার দু'বছরে আমি দু'বার মস্কো গিয়েছিলাম। কাজেই যে সমস্ত Formalities করা দরকার তা জানতাম। তাই ৭-৮ দিনের মধ্যেই ভিসা, টিকিট, হোটেল বুকিং সমস্ত হয়ে গেল। আমি আগস্ট মাসের শেষেই মস্কো পৌঁছে গিয়েছিলাম। ভাগ্যক্রমে Reserve Bank যে ৩০০০-এর বেশি ডলার আমাকে নিয়ে যেতে দিয়েছিল, সেটা সম্পূর্ণ ভাবে ডলারেই নিয়ে যেতে পেরেছিলাম, ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চ র্যের মতো। Airport থেকে বাইরে ২০ ডলার রুবলে পরিণত করতে গিয়ে দেখি প্রতি ডলারে ২০ রুবল পাওয়া যাচ্ছে। এর আগের বারে প্রায় ২৮ টাকাতে এক রুবল পেয়েছিলাম। অন্যান্য সভ্য শহরের মতো মস্কোতেও ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে পৌঁছে গিয়েছিলাম — কোনওরকম ঝামেলা হয়নি।

সেই দিনই পৌঁছে গেলাম সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর Press Information Baureau অফিসে। সেই অফিসের অনেকের সঙ্গেই আগে পরিচিত হয়েছিলাম। এদের মধ্যে একজন যিনি সুন্দর ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারেন, আমাকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে বললেন---"Mr. Ghose, there is no Soviet Union from today." (এঁর নাম Mr. Radyuhi, তিনি আজও ভারতের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'The Hindu'-তে নিয়মিত লিখে থাকেন--- নামের বানানটা হয়তো ভুল হল।

অফিসের অন্য সদস্যরা যারা আগে থেকে চিনতেন ও ইংরেজি বলতেন তাঁরাও দেখলাম বেজায় খুশি হল আমাকে পেয়ে। একজন বন্ধুর মতো বললেন, এবার আপনিও এসেছেন। আমার এবার দিল্লীর Posting টা করিয়ে দিন। ওখানে সব কিছুই পাওয়া যায়, যত খুশি, এখানকার মতো নয়। আমার স্ত্রী, চিনির জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিল। নম্বর উঠেছে ৭৫৩, কবে চিনি পাব জানি না।

ওদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে কথা বলে দিনে ৩০ ডলার পারিশ্রমিকে আমার Interpreter হয়ে গেল — সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত। ২০ দিনে ৬০০ ডলার ওর পক্ষে খুব ভালো পারিশ্রমিক ছিল।

আমি মস্কোর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। তাই চা-এর পাতা, চিনি, কিছু ভুজিয়া ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছিলাম। সকালে একটু গরম জলের ব্যবস্থা করে নিয়ে কামরাতেই চা করে পাজামা পরে স্নান করে নীচে Breakfast করতাম। দিনভর আর খাওয়ার সময় পেতাম না। তাই পেট পুরে টোস্ট আম আর বিস্তর মধু খেতাম।

নিজের কামরায় পৌঁছে সেদিনকার Story লিখে 'টেলিগ্রাফ' অফিসে যাওয়ার আগেই আমার Interpreter চলে আসত। মাইকেল ওর নাম। আমার ফেরত আসবার সময় হয়ে যাওয়াতে ওকে একদিন জানতে চাইলাম চিনির অবস্থা কী রকম। বলল, এখনও পাইনি। শাশুড়ি কোনওরকমে চালাচ্ছেন। আমি তখন বললাম যে চা-এর জন্য অনেকটা চিনি এনেছিলাম---থেকে গেছে। তুমি বাড়ি নিয়ে যাও। কিছুতেই নেবে না। শেষে ওর ছেলের নাম করাতে নিতে রাজি হল।

মোট কথা, দেখলাম চার ধারে অভাব অভিযোগ ছাড়া অন্য কথা নেই। সামনে শীত অথচ ক্ষেতে আলু তৈরি, কিন্তু লোক নেই মাটি খোঁড়ার জন্য। তখন TV-তে Notice দেওয়া হয়, যে কেউ অমুক farm থেকে আলু Harvest করে ৫০ প্রতিশত আলু বিনা পয়সায় বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। বাকি ৫০ প্রতিশত সরকারের লোককে দেবেন। সাইবেরিয়াতে ক্ষেতে ফসল, কিন্তু Harvester combine চালাবার বা মেরামত করার লোক নেই। ক্ষেতেই লাখ-লাখ টন ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

দিনের বেলায় খালি পেটেই থাকতাম কেননা গো মাংস ছাড়া অন্য কোনও খাবার বিশেষ পাওয়া যেত না। তাই সন্ধ্যাবেলাতে এক মাত্র ভারতীয় হোটেলে (সরকারি) গিয়ে পেট ভরে খেতাম, হাতে যথেষ্ট ডলার ছিল বলে।

আমরা ভারতীয় সাংবাদিকরা সাধারণত আমাদের দূতাবাসে রোজ একত্রিত হতাম। অন্য স্থানেও দেখা হত। কিন্তু দেখা হলে খবরের খবর নেওয়ার কথা হতো না। 'আজ কী খেলে' তার কথা হত।

এর মধ্যে দু'জন মহিলা সাংবাদিকের মস্কো থেকে ফেরার ব্যবস্থা হয়ে গেল। একজন বাঙালি, সে আমার Interpreter কে নিয়ে রাত্রে Airport গেল। একলা যাওয়া মহিলাদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে গিয়েছিল।

অন্য একজন, অন্ধ্রপ্রদেশের মহিলা, তাঁকে বললাম যে তিনি যেন দিনের বেলাতেই Airport পৌঁছে যান। প্লেন অনেক রাত্রে থাকলেও ক্ষতি নেই। Airport-এ খাওয়া-দাওয়া করে নেবেন, কিন্তু রাত্রে একলা Taxi নিয়ে যাবেন না।

এগুলো সামান্য ঘটনা বলে মনে হবে। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট হল যে যখন কম্যুনিজমের অন্ত হয়, তখন এই রকম Administrative faliure হয়। এবারও পশ্চিমবঙ্গে "আয়লা" ঝড়ের পরের অবস্থা আমরা দেখলাম। বুদ্ধদেববাবু নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কম্যুনিজম এবার বিদায় নেবে।

লোকেরা মমতা ব্যানার্জিকে এই ব্যাপারের জন্য প্রশংসা করছেন ও করবেন। আপত্তি নেই আমারও। কিন্তু আমার মতে প্রকৃতিও (Nature) আর কম্যুনিজমকে সহ্য করতে রাজী নয়। ২০১১ সালের বিধানসভা ও ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত আর কটা Communist বেঁচে থাকবে? মস্কোতে মোটে ২ জন প্রাণ দিয়ে কম্যুনিজমকে বিদায় দিয়েছিলেন, দেখা যাক ২০১১-এর পর আর ক'জন কম্যুনিস্ট ২০১৪ সালের নির্বাচনের জন্য জীবিত থাকবে।

বলা হয়— "Nature abhors vacuum" । এখন বলতে পারা যায় "Natare abhors communism."

(লেখক 'হিন্দুস্থান টাইমস্'-এর প্রাক্তন সাংবাদিক)

"লোকেরা মমতা ব্যানার্জিকে এই ব্যাপারের জন্য প্রশংসা করছেন ও করবেন। আপত্তি নেই আমারও। কিন্তু আমার মতে প্রকৃতিও (Nature) আর কম্যুনিজমকে সহ্য করতে রাজি নয়। ২০১১ সালের বিধানসভা ও ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত আর কটা Communist বেঁচে থাকবে? মস্কোতে মোটে ২ জন প্রাণ দিয়ে কম্যুনিজমকে বিদায় দিয়েছিলেন, দেখা যাক ২০১১-এর পর আর ক'জন কম্যুনিস্ট ২০১৪ সালের নির্বাচনের জন্য জীবিত থাকবে।"

সেই নেহরু-গান্ধী পরিবার সেই অন্ধকারময় দিন

ইন্দ্রমোহন উপাধ্যায়

ফের মনমোহন সিংকে শিখণ্ডী করে নেহরু-গান্ধী পরিবারই ভারতের ক্ষমতার রাশ হাতে রাখল। দেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য নেহরু পরিবারের মতো অবদান নাকি আর কারও নেই। মনে পড়ছে, যে জওহরলাল নেহরুকে দিয়ে ভারতে গণতন্ত্রের নামে পরিবারতান্ত্রিক শাসনের সূচনা, তাঁর মৃত্যুর পর প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা রামমনোহর লোহিয়ার সেই ঐতিহাসিক উক্তি---- নেহরুর অবদান? ----'অ্যাস টু দি কান্ট্রি, গ্যাস টু দি ওয়ার্লড, ক্যাশ টু দি ফ্যামিলি' অর্থাৎ দেশকে ছাই, বিশ্বকে কথার ফুলঝুরি আর পরিবারকে টাকাকড়ি। এত সংক্ষেপে নেহরুর এত সত্য ও সঠিক মূল্যায়ণ বোধহয় আর কেউ করতে পারেননি। মসনদে বসার তাগিদে লেডি মাউন্টব্যাটেনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের উষ্ণতায় দেশভাগে সায় থেকে শুরু করে কাশ্মীরকে চিরকালীন সমস্যায় পরিণত করে গিয়েছেন তো তিনিই। আর তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী? ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে হাইকোর্টের বিরুদ্ধ-রায় না মেনে চরমতম অগণতান্ত্রিক পথে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন, নেতাদের জেলে পুরে সংসদকে করেছেন বিরোধীশূন্য, সেন্সরশিপ জারি করে সংবাদপত্র ও সংবাদ-মাধ্যমেরও কণ্ঠরোধ করেছেন। এককথায় গণতন্ত্রের গঙ্গাযাত্রা করে ছেড়েছেন।

১৯৭৫ সালের ২৫ জুনের শেষরাতে, অন্যভাবে বললে ২৬ জুনের ভোররাতে জারি হয়েছিল এই জরুরি অবস্থা। আত্মবিস্মৃত জাতি এতদিনের ব্যবধানে সেই দিনটা এবং তার পরের উনিশ মাসের অমাবস্যার চেয়েও নিকষ কালো কাল-খণ্ড টিকে হয়তো ভুলে গিয়েছে। নইলে নেহরু-গান্ধী পরিবারের বউ হয়ে এদেশে আসার প্রায় দু'দশক পর নাগরিকত্ব নেওয়া ইতালীয় বংশোদ্ভূত একজনের হাতে দেশের বৃহত্তম দলের প্রধানের ও বকলমে সরকার চালানোর দায়িত্ব কেউ তুলে দেয়, শরিক হয় 'সোনিয়া লাও— দেশ বাঁচাও'-এর মতো দেউলিয়াপনায়?

ক্যাথেরিন ফ্রাঙ্ক নামে এক মার্কিন মহিলার লেখা 'ইন্দিরা : দ্য লাইফ অব ইন্দিরা নেহরু গান্ধী' নামে একটি বই সম্প্রতি পড়ার সুযোগ হয়েছিল এই কলমচির। 'এই অনন্য সাধারণ মহিলার হৃদয়ের কথা জানতে হলে এর থেকে ভালো বই আর হয় না' এমনই মন্তব্য করেছে 'সানডে মেল'। সত্যিই যথেষ্ট পরিশ্রমী গবেষণায় লিখিত এই বইটিতে ইন্দিরার এক মহিমান্বিত রূপ তুলে ধরার চেষ্টা হলেও জরুরি অবস্থা জারির প্রেক্ষাপটে এতে এমন সব ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যা তাঁর তথাকথিত উজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে ম্লান করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ক্যাথেরিন যা লিখেছেন তার মর্মার্থ এই---এলাহাবাদ হাইকোর্ট নির্বাচনী দুর্নীতির দায়ে তাঁর লোকসভার সদস্যপদ খারিজ করে দেওয়ায় এবং তাঁর 'অবৈধ' সরকারের আদেশ পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে পালন না করার জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণ ডাক দেওয়ায় ইন্দিরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এর পিছনে আমেরিকার হাত আছে, চিলির সি আই এ-মদতপুষ্ট জেনারেল আগাস্টো পিনোচেট ১৯৭৩ সাল যেভাবে সালভাদর আলেন্দেকে উৎখাত ও ধ্বংস করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই সি আই এ-কে দিয়ে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন তাঁকে শেষ করে ফেলবেন। অতএব ঠিক করলেন, বিরোধীদের দাবি মেনে পদত্যাগ নৈব নৈব চ, বরং যাদের দিক থেকে আঘাত আসার সম্ভাবনা তাদেরই আগেভাগে টিট করতে হবে, গারদে পুরতে হবে।

জরুরি অবস্থা জারির যাবতীয় আইনি কাগজপত্র তৈরির ব্যাপারে ইন্দিরার সবচেয়ে বড় বল-ভরসা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। ক্যাথেরিন তাঁকে নিষ্ঠাবান ও সুদক্ষ আইনজীবী যেমন বলেছেন, তেমনি 'স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন' বলেও অভিহিত করেছেন। ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোবার পর সিদ্ধার্থই ইন্দিরাকে বলে দিয়েছিলেন, খবরদার, ভুলেও পদ ছাড়বেন না। আর তার ১২ দিন পর ২৫ জুন দিনভর সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে বসেই ইন্দিরা কর্তব্যকর্ম ঠিক করেছিলেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেশে একটা বাহ্যিক জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সেটা তখনও বহাল ছিল। সিদ্ধার্থ বোঝালেন, দেশের ভিতরে এখনকার যা পরিস্থিতি, তাতে ওই বাহ্যিক জরুরি অবস্থা দিয়ে কোনও কাজ হবে না। জয়প্রকাশের আহ্বানে 'সশস্ত্র বিদ্রোহের ইন্ধন' রয়েছে এবং দেশের অবস্থা 'বিপজ্জনক' হয়ে উঠতে পারে এই যুক্তিতে সংবিধানের ৩৫২ ধারায় অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করতে হবে। যথা পরামর্শ তথা কাজ।

কিন্তু নিজের আইনমন্ত্রী এইচ আর ভরদ্বাজকে ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা জানালেন না ইন্দিরা।

বস্তুত অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন ছাড়া কেউই জানতেন না তাঁর পরিকল্পনার কথা। এমনই কঠোর গোপনীয়তায় পুরো ছকটা কষেছিলেন ইন্দিরা। সিদ্ধার্থ ছাড়া এই অতি বিশ্বস্তদের মধ্যে ছিলেন সচিব ধাওয়ান, ছোট ছেলে সঞ্জয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ওম মেহতা, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল, পি এন ধর ও সারদাপ্রসাদের মতো কয়েকজন। জরুরি অবস্থা জারি যখন ভাবনাচিন্তার স্তরে তখনই ওম মেহতা ও বংশীলালকে নিয়ে সঞ্জয় কোন কোন বিরোধী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হবে তার তালিকা তৈরি করে ফেলেছিলেন। স্বভাবতই তালিকার শীর্ষে ছিল জয়প্রকাশ, মোরারজি দেশাই ও রাজনারায়ণের নাম। নিজের মন্ত্রীদের ওপরও একেবারেই আস্থা ছিল না ইন্দিরার। তাই জরুরি অবস্থা জারির আগে তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠক পর্যন্ত ডাকতে রাজি হননি, ডাকেন পরের দিন সকালে, এক ঘণ্টার নোটিশে। সে বৈঠক আধ ঘণ্টাতেই শেষ। এমনকী মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর তিনি যে বেতার ভাষণ দেবেন, তা তাঁর নিয়মিত ভাষণ-লেখক সারদাপ্রসাদকে দিয়ে লেখাননি, আগের দিন রাত তিনটে পর্যন্ত সিদ্ধার্থের সঙ্গে বসে চূড়ান্ত করেন নিজেই।

এত যে বিশ্বস্ত সিদ্ধার্থ, তাঁকেও কিন্তু পুরো 'গেমপ্ল্যান' জানাননি ইন্দিরা। ২৫ জুন মাঝরাতের পর জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে পরিকল্পনামাফিক বিরোধী নেতাদের ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে সংবাদপত্র অফিসে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে পরের দিন সকালে রাজধানীর কোনও কাগজ বেরতে না-দেওয়া এবং পরের দিন কোর্টও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত যে ইন্দিরা অ্যান্ড সঞ্জয় কোম্পানি নিয়ে রেখেছেন, সেটা বিন্দুবিসর্গও জানতেন না সিদ্ধার্থ। পরে ওম মেহতার মুখে যখন শুনলেন, তখন সিদ্ধার্থ সঙ্গ ছেড়ে ইন্দিরা শুতে চলে গেছেন। তবু তাঁকে তুলে সিদ্ধার্থ এব্যাপারে তাঁর আপত্তির কথা জানালে ইন্দিরা বললেন, ঠিক আছে, সংবাদপত্র অফিসে বিদ্যুৎ বন্ধ করা হবে না, কোর্টেও তালা লাগানো হবে না। আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেও সিদ্ধার্থ পরে বুঝেছিলেন, তাঁকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। ক্যাথেরিন লিখেছেন, সিদ্ধার্থের এই আপত্তির কথা বংশীলালকে ফোনে জানান সঞ্জয়। তাতে বংশীলাল বলেছিলেন, 'ওকে ছুঁড়ে ফেলে দাও, লোকটা দেখছি সব কিছু নষ্ট করে দেবে....আইনজীবী বলে ও নিজেকে কেউকেটা মনে করছে, অথচ ও কিস্‌সু জানে না।'

বিদ্যুৎ বন্ধের ফলে পরের দিন সকালে দিল্লীর গোটা বারো কাগজের মধ্যে কেবল স্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান টাইমস ও মাদারল্যান্ড বেরিয়েছিল জরুরি অবস্থা জারি ও নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর নিয়ে। মাদারল্যান্ডে কে আর মালকানির একটি দুর্ধর্ষ সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর অবশ্য মাদারল্যান্ডের দরজায় চিরকালের জন্য তালা পড়েছিল। তড়িঘড়ি করতে গিয়ে কিছু ফাঁকফোকর থেকে গিয়েছিল বলে তবু তিনটে কাগজের পক্ষে সেদিনের সেই কালো খবরটি দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

পরের দিন থেকে সংবাদপত্রে পুরোদস্তুর সেন্সরশিপ চালু হয়ে গেল। তথ্য দপ্তরকে না দেখিয়ে কোনও সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না। তথ্যমন্ত্রী তখন ইন্দ্রকুমার গুজরাল। অথচ তাঁরই ওপর পড়ল প্রথম খাঁড়ার কোপ। ২৬ মে মন্ত্রিসভা বৈঠকের পর সাতসকালেই তাঁর সঙ্গে দেখা সঞ্জয়ের। পাশেই ছিলেন ইন্দিরা। আদেশের ভঙ্গিতে গুজরালকে রূঢ় ভাষায় বললেন সঞ্জয়, সম্প্রচারের আগে সব নিউজ বুলেটিন এখন থেকে আমার কাছে পাঠাবেন। ক্যাথেরিন লিখেছেন, ক্ষুণ্ণ গুজরাল মুখের ওপর সঞ্জয়কে বলে দেন, তা সম্ভব নয়। ইন্দিরা এসব শুনেও যেন শুনলেন না।

সঞ্জয়ও ছাড়ার পাত্র নন। বেলার দিকে মায়ের অনুপস্থিতিতে আবার পাকড়াও করলেন গুজরালকে। বললেন, আপনি নিজের দপ্তর ঠিকমতো চালাচ্ছেন না। গুজরাল আপত্তি জানালেন। বললেন, 'শোনো, তোমার জন্মের আগে তোমার মায়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, যদি কিছু বলতে হয় ভদ্র-সভ্যভাবে বলবে। আমার মন্ত্রকে নাক গলানোর কোনও অধিকার তোমার নেই।' ছিলেন মহম্মদ ইউনুস। তিনিও পরের দিন গুজরালকে ফোন করে বললেন, বি বি সি ভুলভাল খবর দিচ্ছে, ওদের দিল্লী অফিস বন্ধ করে দিন, ওর সংবাদদাতা মার্ক টুলিকে ডেকে এনে জামাকামড় খুলে কয়েক ঘা চাবুক মারুন, তারপর জেলে পাঠান। গুজরাল জবাব দিলেন, বিদেশী সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা আমার মন্ত্রকের কাজ নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বি বি সি-র খবরের মনিটরিং রিপোর্ট তলব করে দেখলেন, ইউনুসের অভিযোগ ঠিক নয়; জগজীবন রাম বা সর্দার স্বরণ সিংকে গৃহে অন্তরীণ রাখা হয়েছে এমন কোনও খবর তারা দেয়নি। কথাটা তিনি ইন্দিরাকে জানালেন। কিন্তু ফল হল এই যে, সেদিনই সন্ধ্যায় গুজরালকে ডেকে পাঠিয়ে ইন্দিরা জানিয়ে দিলেন, তথ্য মন্ত্রকের দায়িত্ব থেকে আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে আরও শক্ত হাতে ও অন্যভাবে তথ্য মন্ত্রক সামলানো দরকার।

শুধু সেন্সরশিপ নয়, সাংবাদিকদের আরও অনেক অধিকার খর্ব করলেন ইন্দিরা। ১৯৫৬ সালের যে আইনে সংসদীয় বিতর্ক রিপোর্ট করার ব্যাপারে সাংবাদিকরা স্বাধীনতা ভোগ করতেন অর্ডিন্যান্স জারি করে তা বাতিল করা হল। তুলে দেওয়া হল প্রেস কাউন্সিল। নিয়ন্ত্রণের সুবিধার জন্য চারটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে মিলিয়ে সোভিয়েট 'তাস'-এর আদলে গড়া হল একটিমাত্র সংবাদ সংস্থা 'সমাচার'। কিছু সংবাদপত্র গোড়ায় কিছুটা প্রতিবাদী হলেও পরে সব কিছুই মেনে নিল। ব্যতিক্রম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর মতো হাতে গোনা কয়েকটি। আসলে এদেশে খবরের কাগজ যাঁরা চালান তাঁদের বেশির ভাগই বড় শিল্পপতি। লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি পাওয়ার জন্য সরকারকে তাদের রসেবশে রাখতেই হয়। অতএব অনতিবিলম্বে আত্মসমর্পণ।

২৫৩ জনের মতো 'বেয়াদপ' সাংবাদিককে জেলে পোরা হয়েছিল বলে ক্যাথেরিন হিসাব দিয়েছেন। গার্ডিয়ান, বাল্টিমোর সান, ওয়াশিংটন পোস্ট-এর মতো নামকরা সব কাগজের ৪০ জন বিদেশী সংবাদদাতাকে দেশ ছাড়তে বলা হয়েছিল, কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁদের সরকারি পরিচয়পত্র। বি বি সি-র মার্ক টুলির ওপর ইন্দিরার ম্যানেজাররা তো ছিলেন সর্বদাই খড়্গহস্ত।

এতসব কুকর্ম করেও কংগ্রেস ও তার নিয়ন্তা নেহরু-গান্ধী পরিবারের লোকজনেরা এখন গণতন্ত্রের বড়াই করেন কোন মুখে? মুম্বাই বিস্ফোরণের সময় টেলিভিশন মাধ্যমের কিছু সাংবাদিকের অত্যুৎসাহী হঠকারি আচরণের ধুয়ো তুলে এখন আবার সংবাদ-মাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর নানা নিয়ন্ত্রণ আরোপে উদ্যোগী হয়েছে এই গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা। কাগজপত্র সব তৈরি। কেবল সুযোগের অপেক্ষা। এত 'বড় জয়ের' পর তাদের আর রুখবে কে? সাংবাদিকদেরই সজাগ ও সাবধানে থাকতে হবে।

দেখে - শুনে

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এম নেতৃত্ব নিজেদের বাঁচাচ্ছে মরছে নীচের তলার কর্মীরা

নিশাকর সোম

এই প্রতিবেদনটি যখন বেরোবে, তখন সিপিএম রাজ্য-কমিটির সভা শেষ হয়ে যাবে। সে সম্পর্কে কোনও বক্তব্য হাজির করা গেল না এই লেখাতে। রাজ্য-কমিটির সভার কয়েকদিন আগে থেকেই খেজুরিতে তৃণমূলের "সন্ত্রাস মুক্ত" অভিযান চলছে। সংবাদপত্রের দেওয়া খবর অনুযায়ী জনরোষে সিপিএম-এর পার্টি অফিস জ্বলছে---সিপিএম-এর নেতাদের বাড়ির আশপাশ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। যাবেই---কারণ এই খেজুরি থেকেই তো নন্দীগ্রাম মুক্ত করার অভিযান সিপিএম চালিয়েছিল। তৃণমূলের অভিযান এমন তীব্র যে, জনগণ রাজ্যের ৫ মন্ত্রীকে খেজুরিতে ঢুকতে দেননি, অবরোধ করে রেখেছিল। ঠিক যে ভাবে সিপিএম মমতাকে অবরোধ করে রাখতো। তৃণমূলের অঘোষিত মুখপত্র তো লিখেই দিয়েছে, "জবাব"।

সি পি এম নেতৃত্বের অহংকারি পরিচালনার ফলে শুধু নির্বাচনী পরাজয় নয়, এখন নীচের তলার কর্মীরা "জনরোষের" শিকার হচ্ছেন।

সিপিএম পার্টি নেতারা নিজেদেরকে নিরাপদে রাখতেই ব্যস্ত। কিছু পার্টি সদস্য মনে করেন এখনও তো আমাদের হাতে রাজ্য সরকার আছে। তারা জানেন না ইন্দোনেশিয়াতেও কেন্দ্রীয় সরকারে, মিলিটারিতে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল। কিন্তু দুটি সংগঠন ক্যামি এবং ক্যাফি কয়েকঘণ্টার মধ্যে পার্টির সমগ্র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সমেত কয়েক হাজার কমিউনিস্ট কর্মীকে কচুকাটা করেছিল। আর যে অস্ত্র দিয়ে এ কাজ হয়েছিল সেগুলি চীন এবং রাশিয়ার তৈরি। আজ মেদিনীপুর সাফ হচ্ছে---দীপক সরকার, লক্ষ্মণ শেঠ, সূর্য মিশ্র, সুশান্ত ঘোষ কোথায়? নীচের তলার কমরেডদের জনরোষ থেকে কে বাঁচাবে? প্রতিটি কাজের তার বিপরীত ক্রিয়া হবেই।

এখন সিপিএম-এর পাশে সিপিআই-আরএসপি-ফরওয়ার্ড ব্লক থাকবে না। কারণ এইসব পার্টিগুলির নির্বাচনী পর্যালোচনায় সিপিএম-কে দোষী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই তিন পার্টি বলেছে, সিপিএম ধনীদের তোষণ বন্ধ করুক, গরীবদের জন্য, খেতমজুরদের জন্য, বন্ধ কলকারখানা খোলার জন্য কিছু কাজ করুক। সিপিআই---আরএসপি---ফরওয়ার্ড ব্লক বস্তুত বামফ্রন্টে নেই। আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে গোপন বা প্রকাশ্য আঁতাত গড়ে তুলবেই। সিপিআই হয়তো 'একলা চলো রে' নীতি নিতে পারে। ১৯৭১ ফিরে আসছে। এখন সিপিএম-এর নেতা থেকে লোকাল কমিটি পর্যন্ত ধান্ধাবাজ কামাও পার্টির অভ্যুত্থান ঘটেছে। ম্যাসলম্যানরা ধীরে ধীরে তৃণমূলে চলে যাচ্ছে। তারাই দেখিয়ে দেবে সিপিএম-এর অস্ত্রশস্ত্র রাখার গোপন স্থান।

সম্প্রতি লালকৃষ্ণ আদবানী বলেছেন—"একসময়ে সিপিআই কংগ্রেস-কে সমর্থন করে পার্টিটাকে শেষ করে দিয়েছিল। বর্তমানে সিপিএম কংগ্রেসের লেজুড় হওয়ার ফলে পার্টিটাকে শেষ করে দিয়েছে।" অত্যন্ত সঠিক কথা। ১৯৬৯ সালে সিপিএম ইন্দিরা গান্ধীকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সমর্থন করেছিল, বাংলাদেশে অভিযান সমর্থন করেছিল। তার ফল হাতে-হাতেই পেয়েছিল---১৯৭১-৭২-এ। এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। এ ছাড়া যে অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছিল, তার মাশুল দিতে হবে। সিপিএম পার্টির একাংশ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, এখন যা ঘটছে তা পার্টির ৩২ বছরের কাজের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফল। সমাজ একটা আয়না। যেমন মুখ দেখাবে তেমনি মুখ দেখবে। এছাড়া ১৯৭১-৭২-এর আগে ১৯৬৭, ১৯৬৯-এ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার ফেলে দেওয়াতে জনগণের সহানুভূতি সিপিএম-এর প্রতি ছিল। এছাড়া তখন রাজ্য-নেতৃত্বে ছিলেন--- জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার। আজকে তাঁদের ছায়ামাত্র নেই। তখন পার্টির গোপন (আন্ডারগ্রাউন্ড) সংগঠন ছিল। যাঁর নেতৃত্বে ছিলেন অলোক মজুমদার। আজ নেই অলোকবাবু অথবা তাঁর গড়া সংগঠন।

সিপিএম-এর রাজ্য কমিটিতে প্রশ্ন উঠেছে, প্রশাসনের স্থবিরত্বের ফলে খেজুরি থেকে দলে দলে সিপিএম নেতা-কর্মীরা পালাতে বাধ্য হলেন কেন? কারণ সোজা—পুলিশ আজ সাহস পাচ্ছে না সিপিএম কে রক্ষা করার। পুলিশ প্রশাসন মনে করছে ২০১১-তে বিরোধীরাই ক্ষমতায় আসছে।

সর্বোপরি আজকে বেশিরভাগ মানুষ সিপিএম-কে পছন্দ করে না। তাইতো নির্বাচনে এই হাল। নির্বাচনের পরে রাজনৈতিক ধাক্কায় এবং পরে আয়লার বেগে সিপিএম পার্টি তথা সরকার ভেসে গেছে। এ ছাড়া ১৯৭১-৭২-এর সারা ভারতেও সিপিএম-এর প্রতি বেশ কিছু নেতার করুণা ছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গ-কেরলে পার্টির অন্তিম অবস্থা। ত্রিপুরাতেও ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ভারতবর্ষে তথাকথিত মার্কসবাদী বামপন্থার অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হয়ে গেছে।

সিপিআই, আরএসপি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নীচের তলার বেশিরভাগ কর্মী বিরোধী দলে যোগ দিচ্ছেন এবং দেবেনও।

সিপিএম-এরও কর্মীদের বড় অংশ পিঠ বাঁচাবার জন্য তৃণমূলে আশ্রয় নিচ্ছে। তবে একাংশ মাওবাদী দলে যোগ দিয়ে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করবে। অদূর ভবিষ্যতে এই রাজ্যে মাওবাদীরা শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তখন আক্রান্ত হবে সব সংসদীয় দলই।

আজ সিপিএম-এর রাজ্য কমিটিতে প্রশ্ন উঠেছে, প্রশাসনের স্থবিরত্বের ফলে খেজুরি থেকে দলে দলে সিপিএম নেতা-কর্মীরা পালাতে বাধ্য হলেন কেন? কারণ সোজা—পুলিশ আজ সাহস পাচ্ছে না সিপিএম-কে রক্ষা করার। পুলিশ প্রশাসন মনে করছে ২০১১-তে বিরোধীরাই ক্ষমতায় আসছে। হলদিয়ার সন্ত্রাসবাবু লক্ষ্মণ শেঠ এবং সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী বলেই ফেলেছেন "সরকারে থেকে কি লাভ?" যথার্থ প্রশ্ন। সততা থাকলে সিপিএম-এর মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে বিধানসভা নির্বাচনের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারত! সাহস নেই। এখনও আশা ড্যামেজ কন্ট্রোল করা যাবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ড্যামেজ কন্ট্রোল করা যায়নি। পরন্তু ফুটোটা বড় হয়েছে। আগেও লেখা হয়েছে, আবারও লিখছি, নেতৃত্ব মন্ত্রিত্ব-এর কোনও বদলের কথা সিপিএম রাজ্য-কমিটি করবে না। সব দোষ নীচের তলার "স্ক্রুটিনির"। নেতারা ধোয়া তুলসী পাতা, কর্মীরা তো নন্দ ঘোষ। যত দোষ নন্দ ঘোষের।

ধন্য সিপিএম নেতৃত্ব। আরও দুর্গতি এদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

অন্য রকম

বাপ কা বেটি

মেয়েরা কী পারে, কী পারে না---- এই লড়াইয়ে তিনি পা দেননি কখনও। নিজেকে সেই অঙ্কে কোনওদিন বিচারও করেননি। আর পাঁচটা মেয়ের মতোই বড় হয়েছেন। জীবন-যাপনও করেছেন সাধারণভাবে। গরিব ঘরেই বড় হয়েছেন অনিতা সিংহ। জীবনের সব বাধা পেরিয়ে আজ তিনি সফল, একজন প্রকৃত মহিলা হিসাবে। তাঁকে দেখে অনেকেই বলেন, 'বেটি হো তো অ্যায়সা।' বাবার দুঃখমোচনে ছেলের থেকে কোনও অংশে কম নন তিনি।

এই সেই মেয়ে।

বাবা জনার্দন সিংহ মুদির দোকানে কাজ করতেন। উপার্জন যা হত, 'তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরায়।' এখন আর জনার্দনবাবুর সে অবস্থা নেই। মেয়ে অনিতাই 'লক্ষ্মী' হয়ে ঘর আলো করেছেন। অনিতা স্কুলজীবন থেকেই সাহসী। ঘরে অভাব থাকলেও, মনে অভাব ছিল না। জীবনে বড় হব, উপার্জন করব। বাবার অভাব ঘোচাতে হবে---এই স্বপ্নই ছোটো থেকে দেখেছেন তিনি। সরকারি স্কুলে পড়েছেন অনিতা। যাতে বাবার খরচ না বেড়ে যায়। টিউশনি মাস্টাররা টিউশনি পড়ার কথা বললেও, তিনি নিজে ঘরেই পড়েছেন। নিজে নিজেই অনুশীলন করেছেন সব পাঠ্য। স্নাতক স্তর পর্যন্তও সব কিছু নিজেই পড়েছেন। এই সময়েই ঠিক করেন আর নয়। এবার উপার্জন দরকার। শু(করলেন মধু সংগ্রহের কাজ। তারই বয়সের মেয়েরা যখন আরশোলার ভয়ে দৌড়ে পালায়, সেখানে অনিতা গ্রামে-গ্রামে মধু সংগ্রহ করেছেন। নিজের সংসারকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। কথায় আছে 'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।' অনিতার ে(ত্রেও তাই হয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবসা চড়চড়িয়ে বাড়তে লাগল। বাবাকেও আর আগের মতো কষ্ট করতে হল না। মেয়ের সঙ্গেই হাতে হাত লাগালেন বাবা জনার্দন। শু(করলেন ইতি-উতি মধু সংগ্রহের কাজ। পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে শু(হল অনিতার মিশন। রোজগার, পড়াশোনা— দুই-ই সমানতালে চালাতে লাগলেন অনিতা। এরই পাশাপাশি শু(করলেন দুঃস্থদের জন্য টিউশনি পড়ানো। তাদের শি(িত করে এক একজন অনিতা গড়ে তোলা। অনিতা চায় সব মেয়েই যেন রোজগেরে মেয়ে হয়। যাতে বাবার পাশে দাঁড়াতে পারে। নামী-দামী সাজের উপকরণ কিনে পয়সা খরচের প(পাতী তিনি নন। বরং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সঞ্চয় করেছেন।

অনিতার এই সাহসিকতা, তাঁর এই কৃতিত্ব জায়গা করে নিয়েছে বিহারের পাঠ্যপুস্তকেও। সত্যিই অনিতা দেখিয়ে দিয়েছেন 'বাপ কা বেটা' যেমন সম্ভব, তেমনই 'বাপ কা বেটি'ও হয়।

বাংলাদেশে আত্মঘাতী মহিলা জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ চলছে

ফজলে নোমানী।। লোকচক্ষুর অন্তরালে আবারও বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে ইসলামী জঙ্গিবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

সম্প্রতি বৃটেনের দৈনিক 'দ্য ইনডিপেনডেন্টে' প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ইজ সেফ হেভেন ফর ইসলামিক টেররিস্ট' — শীর্ষক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সিঙ্গাপুরের নানইয়াং টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগীয় প্রধান আল কায়েদা বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত রোহান গুণরত্না তার এক সম্প্রতি গবেষণাপত্রে এ বিষয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এ দেশের অধিকাংশ জনগণের আর্থিক অসচ্ছলতার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর জঙ্গিসংগঠন এখানে শক্ত 'নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। রোহানের আশঙ্কার প্রমাণ মিলেছে রাজধানী থেকে জেএমবি-র বোমা বিশেষজ্ঞ জাহিদুর রহমান মিজান ওরফে বোমা মিজানের গ্রেফতারের ঘটনায়।

মিজান তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বলেছে, মায়ানমারের আরাকান প্রদেশের বিদ্রোহী সশস্ত্র সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও)-এর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। এসব বিষয়ে পুলিশের ঊর্ধতন মহল ঘটনার আংশিক সত্যতা রয়েছে বলে মন্তব্য করে জঙ্গিবাদ সরকারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে বলেই অতীতের ন্যায় দাবি করেছেন। তবে বাস্তব অবস্থা হচ্ছে---দেশের উত্তরাঞ্চলে পুলিশের খাতায় এক নম্বর ওয়ানটেড জেএমবি প্রধান সাঈদুর রহমান জেএমবিকে আবার পুনর্গঠিত করছে।

এবার জেএমবির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে এর নারী সদস্যরা। কুষ্টিয়ার খোকশা এলাকার রামচাঁদের ময়দান, টাঙ্গাইলের কালিহাতি, জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং রাজশাহীর বাগমারায় জেএমবির নারী সদস্যদের একাধিক কন্ডিশনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। সাঈদুরের খোঁজে এসব জায়গায় পুলিশ হানা দিলেও ধরা পড়েনি সাঈদুর রহমান। একটি গোপন সূত্রমতে, কুষ্টিয়ার খোকশা এলাকার রামচাঁদের ময়দানে বিকেলে তিন দিন জেএমবির মহিলা ইউনিট জড়ো হয়েছিল। দেড় শতাধিক মহিলা সদস্যের মধ্য থেকে কয়েক দফা বাছাইয়ের পর প্রায় ৫০ জনের কয়েকটি উপদল নির্বাচিত করা হয়। যারা পৃথকভাবে বিভিন্ন বাসা-বাড়ি বা হোটেলে অবস্থান করবে সেটাই নিয়ম। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে তারা মাঠে জড়ো হতো। সেখান প্রথমে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ দিয়ে শপথ করানোর পর, হাতে-কলমে বিভিন্ন অস্ত্র চালনা এবং এক্সপ্লোসিভের বিভিন্ন কেমিক্যাল চেনানো হয়। এখানে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া এক সদস্যকে পুলিশ গ্রেফতার করায় এ সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া গেছে। মহিলা জঙ্গির নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেছেন, এসব সদস্য দৈনিক কয়েক হাজার টাকা পেত। কুষ্টিয়ায় অবস্থানকালে তিন দিনেই একেকজন আয় করেছে ১৬ হাজার করে টাকা। তাদের উর্দু জিহাদী বই পড়ানো হতো। উর্দু ভাষা

আত্মঘাতী মহিলা জঙ্গি।

শিক্ষা দেওয়ার পর পাকিস্তান পাঠানোর পরিকল্পনাও ছিল। এই দলটির একটি অংশ বর্তমানে জামালপুরে অবস্থান করছে। ইতিমধ্যে তারা টাঙ্গাইলের কালিহাতির কয়েকটি তালিমসভা করেছিল। ধরা পড়া জঙ্গির তথ্যানুযায়ী, তারা প্রত্যেকেই পৃথক। যে যার মতো টাঙ্গাইলের নির্দিষ্ট বাড়িতে আত্মীয়ের মতো থাকে। যাওয়ার সময় মিষ্টিও কিনে নিয়ে গিয়েছিল, যাতে এলাকাবাসী সন্দেহ না করে। সেখানে তালিমসভা শেষে জেএমবি প্রধান শায়খ রহমানের কবর জিয়ারতের জন্য তাদের একাংশ বর্তমানে জামালপুরে অবস্থান করছে। শায়খ রহমানের মতোই জেএমবি সদস্য খালেদ সাইফুল্লাহরও ফাঁসির সাজা হয়েছিল। তার কবর জিয়ারত করতে ফিরোজপুর যাওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে এসব নব্য মহিলা জঙ্গির। এর মাঝে এ দলটি ঢাকাতেও আসতে পারে বলে তথ্য পেয়েছে পুলিশ। ঢাকার মহাখালী এবং মিরপুর এলাকায় এই সদস্যদের অবস্থান করার জন্য পূর্ব থেকেই ভিন্ন নামে, ভিন্ন পরিচয়ে জেএমবির পক্ষ থেকে বাসাও ভাড়া করা রয়েছে। মহাখালীর একটি 'ম' আদ্যক্ষরের আবাসিক হোটেলে ইতিপূর্বে তাদের সদস্যরা উঠেছিল বলেও তথ্য রয়েছে। সূত্রমতে আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে জেএমবি প্রধান সঈদুর রহমানেরও ঢাকায় উপস্থিতির কথা রয়েছে। নব্য মহিলা রেজিমেন্টকে ট্রেনিং শেষে তার বচনের মাধ্যমেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হবে। একটি সূত্রমতে, সরকারের ৪ শীর্ষ সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে অপারেশনে নামার মাধ্যমেই অভিষেক ঘটানো হবে নব্য জঙ্গিদের।

বৃটেনের 'দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট' পত্রিকায় ২৪ মে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, শায়খ রহমান তার জবানবন্দীতে বলেছিল, বৃটেনের জঙ্গি সংগঠন মুহাজেরিনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। ই-মেলের মাধ্যমে শায়খ রহমান বৃটেনভিত্তিক এই জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। রিপোর্টে আরও বলা হয়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৃটিশ বংশোদ্ভুত ইসলামী জঙ্গি প্রায়ই বাংলাদেশে এসে এখানকার জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তারা এই জঙ্গিদের জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করছে। ইতিমধ্যেই ৪ হাজার বৃটিশ মুসলমান আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এসেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে সিঙ্গাপুরের নানইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের প্রধান আল কায়েদা বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত রোহান গুণারত্না তার গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে প্রায় দু'ডজন ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব থাকলেও হরকত-উল-জিহাদী ইসলামী-বাংলাদেশ (হুজি, জেআইবি) এবং জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) ভারতের চরমপন্থী স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্টের সঙ্গেও এসব জঙ্গি সংগঠনের যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। রোহানের তথ্য মতে, নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (মাওইস্ট), ফিলিপিন্সের নিউ পিপলস আর্মি, শ্রীলঙ্কার এলটিটিই এবং ভারতের পিপলস্ ওয়ার গ্রুপ (পি ডব্লিউ জি) অতীতে তাদের ধর্মীয় রাজনৈতিক বিরোধী হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। যেসব নাগরিক জীবন বাঁচাতে তাদের যুদ্ধংদেহি মনোভাবের প্রতি একমত হয়েছে তাদের কাজে লাগিয়েছে নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে। এসব মৌলবাদী গ্রুপের সঙ্গে অন্য যে কোনও দেশের যোগাযোগ থাকা খুব স্বাভাবিক এবং তা ঘটতে শুরু করেছে।

পুলিশী তথ্যমতে, ২০০৪ সালে শায়খ আব্দুর রহমানের স্ত্রী নূরজাহান বেগমকে 'শূরা' বোর্ডের প্রধান করে জেএমবির মহিলা দল গঠিত হয়। যার অধীনে বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ৫শ' মহিলা সুইসাইড স্কোয়াড সদস্য রয়েছে। শায়খ রহমানের মেয়ে আফিফা বেগম,

বাংলাভাই

বাংলাভাইয়ের স্ত্রী ফাহিমা বেগমসহ অধিকাংশ জেএমবি সদস্যের স্ত্রীরা ও মহিলারা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এরা প্রাথমিকভাবে মহিলাদের দাওয়াতি কার্যক্রমের মাধ্যমে দলে ভেড়ায়। এরপর অর্থবিত্তের লোভে দরিদ্র-অসহায় মহিলাদের ইসলামি রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নামে অনৈতিক পথে নামতে বাধ্য করে। বর্তমানে জেএমবির মহিলা দল শূরা বোর্ড, দাওয়াতি সদস্য, সদস্য ও কর্মী ৪ ভাগে বিভক্ত হয়ে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। এসব মহিলা টেলিফোনে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলে। এদের সাঙ্কেতিক ভাষার কিছুই বুঝতে পারে না আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। কাজেই এদের মোবাইল ট্র্যাপ করলেও ভাষা বোঝা দুরূহ হয়ে পড়ে।

২০ ফেব্রুয়ারি টঙ্গীর ঘরতৈল গ্রাম থেকে জে এম বি-র মহিলা সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য নূরজাহান, মর্জিনা, মীনা আখতারকে গ্রেফতারের পর যাবতীয় তথ্য পায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। আর সম্প্রতি জেএমবির বোমা বিশেষজ্ঞ বোমা মিজানকে গ্রেফতার করতে গেলে তার স্ত্রী জেএমবির মহিলা সদস্য আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে তার পাঞ্জা উড়ে গেলেও তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সৌজন্যে ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ।

ডুয়ার্সে চা-শ্রমিকরা ধর্মান্তরিত হচ্ছে

সংবাদদাতা।। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের ধর্মান্তরকরণের শিকার হচ্ছে গরীব চা-শ্রমিকরা। তাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে একপ্রকার জোর পূর্বক খৃস্টান করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই পাদ্রীরা একাজে হাজার হাজার টাকা ব্যয়ও করছে। গরীব চা শ্রমিকরা নিজেদের পরিবারের কথা ভেবে, খুব স্বাভাবিকভাবেই কু-চক্রে ফেঁসে যাচ্ছে। মিশনারীরাও তাদের 'ধর্মান্তরকরণ মিশন' সফল করতে আদা-জল খেয়ে মাঠে নেমেছে। বহু বিদেশী পাদ্রীকেও তারা কাজে লাগাচ্ছে বলে স্থানীয় শ্রমিকদের অভিযোগ। বিগত কয়েক বছরে মিশনারীদের এই চক্র ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসন সব কিছু জেনেও, কোনও গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ হাতে নেয়নি। গরীব চা-শ্রমিকদের একটা বড় অংশ জনজাতি হওয়ায়, খৃস্টানরাও খুব সহজে এর ফায়দা লুটছে। নেপালী চা শ্রমিকরাও জড়িয়ে পড়ছে পাদ্রীদের মুখোশধারী কথাবার্তায়।

এই অবস্থায় কিছুটা হলেও, আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন চা-শ্রমিকরা। বিগত কয়েক বছরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম জাগরণ সমন্বয় বিভাগের কাজ শুরু হয়েছে। তাদের কাজের দ্রুত হালে প্রসার ঘটছে।

ধর্ম জাগরণ বিভাগ অনেক অঞ্চলেই ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সফল হয়েছে। মিশনারীরাও এতে যথেষ্ট ভীত। প্রশাসন একেবারে মৌন হওয়ায়, পাদ্রীদের প্রভাব এখনও পুরোপুরি মুক্ত নয়। এরই মধ্যে তারা অনেক জায়গাতে গীর্জা তৈরিরও ফন্দি চালাচ্ছে বলে গোপন সূত্রে খবর। বর্তমানে জনজাতিদের চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ায়, অনেক অঞ্চলে তারা নিজেদের উদ্যোগে মন্দির তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। ধর্ম জাগরণ সমন্বয় বিভাগ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। তবে তারাও পর্যাপ্ত অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য সেভাবে করে উঠতে পারছে না। সমন্বয় বিভাগের পক্ষ থেকে বিজয় বাকলা সাধারণ মানুষের কাছে এবিষয়ে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে কেউ কোনও সাহায্য করতে চাইলে ফোন করুন ঃ (৭৯১) ৯৪৩৪৯৬৯১৪৪।

ইসলামপুর হাসপাতাল

ওষুধ কেনাতে লক্ষ লক্ষ টাকার অনিয়ম

মহাবীর প্রসাদ টোডি, ইসলামপুর।। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ওষুধ কেনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ওষুধ কেনা সংক্রান্ত কাগজপত্র বা ফাইলপত্র হেপাজতে নিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরুও হয়েছে বলে জানা গেছে।

কনফেডারেশন অব স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের অভিযোগ, কয়েক লক্ষ টাকার এই অনিয়মের পিছনে বামপন্থী কর্মচারী সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল ও কো-অর্ডিনেশন কমিটির একাংশ জড়িত। তারা দোষীদের কড়া শাস্তির দাবী করেছে। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর তদন্তের কথা স্বীকার করেছে। জয়েন্ট কাউন্সিল অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে কো-অর্ডিনেশন কমিটিও দোষীদের শাস্তি চেয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে যে, হাসপাতালের ওষুধ কেনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অনিয়মের অভিযোগ উঠছিল। সম্প্রতি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ পার্থসারথি ভট্টাচার্য আচমকা হাসপাতালে হানা দেন এবং নথিপত্র দেখে তাঁর সন্দেহ হওয়ায় সেগুলি তিনি নিয়ে চলে যান।

অন্যদিকে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রেই জানা গেছে যে, প্রাথমিকভাবে হিসাবপত্র খতিয়ে দেখে কম করেও ৪০ লক্ষ টাকার অনিয়ম হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতা সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের ধার্য রেটের তুলনায় অনেক বেশি দামে ওষুধ কেনা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠছে। এছাড়া স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদনহীন সংস্থাকে বরাত পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। হাসপাতালের কর্মচারীদের একাংশই বলেন যে, দীর্ঘদিন ধরে এই ঘুঘুর বাসা চলছে। অবিলম্বে ভিজিল্যান্স বসানো উচিত।

এ ছাড়া সম্প্রতি হাসপাতালে নানা অনিয়মের প্রতিবাদে ১৫ জন বামপন্থী কর্মী সংগঠনের সদস্য কনফেডারেশনে যোগ দিয়েছে। কনফেডারেশনের ইসলামপুর মহকুমা সম্পাদক অরূপ দাস বলেন যে, শীঘ্রই ওই অনিয়মের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবী করে মহকুমা শাসককে লিখিতভাবে জানাব।

এদিকে এই জেলার তথ্যাভিজ্ঞ মহল অভিমত প্রকাশ করে বলেছে যে, বাম জমানায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এমন দুর্নীতি বহু জায়গায় চলছে।

জুয়েল গার্লোসা ধৃত, শান্ত হবে কি উত্তর কাছাড় ?

সংবাদদাতা।। অবশেষে গত ৬ জুন খৃস্টান চার্চ মদতপুষ্ট ডিমাসা জঙ্গি গোষ্ঠী ডি এইচ ডি (গার্লোসা) পরবর্তী তিনমাসের জন্য যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করল। 'করল' না বলে বরং করতে বাধ্য হল বললেই সম্ভবত সঠিক বলা হবে। কেননা, এর আগে প্রশাসন কোনওমতেই তাদের বাগে আনতে পারেনি। গত একবছরের বেশি সময় ধরে দক্ষিণ অসমের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় সক্রিয় এই জঙ্গিদের হাতে সাধারণ মানুষ, ট্রেনযাত্রী, নিরাপত্তা কর্মী, মায় জনজাতি, অ-জনজাতি সবরকম মানুষ বারে বারে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গত একবছরের মধ্যে ছ'মাসও বদরপুর-লামডিং লাইনে যাত্রীবাহী অথবা মালবাহী কোনও ট্রেনই সুষ্ঠুভাবে যাতায়াত করতে পারেনি। রেলের কর্মচারীরা বারবার এই পাহাড়-লাইনের ছোট-বড় স্টেশনগুলিতে নিরাপদে সরকারি কাজের দায়িত্ব পালন করতে না পেরে বদরপুরে পালিয়ে এসেছে। জুয়েল গার্লোসা ও তার অন্য দু'জন জঙ্গি সাকরেদকে অসম পুলিশ ব্যাঙ্গালোর পুলিশের সাহায্যে কয়েকদিন আগেই সেখান থেকে গ্রেপ্তার করে গুয়াহাটি নিয়ে আসে।

তবে এই দাপুটে হিংস্র জঙ্গি নেতার গ্রেপ্তারের বেশির ভাগ কৃতিত্ব কিন্তু অসম পুলিশের মহানির্দেশক জি এম শ্রীবাস্তবের। তিনিই ব্যাঙ্গালোর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গার্লোসাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হন। গত ৬ জুন অসম পুলিশের এই বড়কর্তা সাংবাদিকদের সামনে বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি বলেন, ব্যাঙ্গালোর পুলিশ জানায়---দেশের প্রধান তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র ব্যাঙ্গালোরে কয়েকজন উত্তর-পূর্বের জনজাতি যুবককে দেখা গেছে। তখন অসম পুলিশের একটি দল ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে কয়েকদিন তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। তারা জানতে পারেন গার্লোসা একটি জিমনাসিয়ামে প্রতি মাসে মাত্র ষাট হাজার টাকা খরচ করেন। তখন অসম ও ব্যাঙ্গালোর পুলিশ এক যৌথ অপারেশনে ওই জিমনাসিয়াম থেকেই জুয়েল গার্লোসার মতো কট্টর জঙ্গি নেতাকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়।

গার্লোসা এবং তার সঙ্গে ধৃত সামির আহমেদ ও পার্থ ওয়ারিসাকে গুয়াহাটির জেলা দায়রা বিচারকের আদালতে তোলা হলে গত ৬ জুন বিচারক তাদের চৌদ্দ দিনের রিমান্ডে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, গার্লোসা এবছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকেই ব্যাঙ্গালোরে ঢুকেছিল। সেখানে সে ডিব্রুগড়ের বাসিন্দা এবং ব্যাঙ্গালোরে এইচ এস বি সি ব্যাঙ্কে কর্মরত উপরোক্ত সামির আহমেদের আশ্রয়ে ছিল। সামির

ধৃত ডি এইচ ডি জঙ্গি গার্লোসা।

ব্যাঙ্গালোরে গার্লোসাকে দেবজিৎ সিনহা ছদ্মনামে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্সও বানিয়ে দেয়। পরিচয়পত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্সে ছবিটা গার্লোসার এবং ঠিকানা রয়েছে সামির আহমেদের। সামির ডি এইচ ডি (গার্লোসা) জঙ্গিদলের দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক (সেকেন্ড ইন কম্যান্ড) পার্থ ওয়ারিসার-এর সহপাঠী ছিল। ডি জি পি শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, ডি এইচ ডি (গার্লোসা)-র আর এক প্রথম সারির নেতা নিরঞ্জন হোজাই এসময়ে দক্ষিণ এশিয়ার কোনও দেশে রয়েছে। তাকেও শিগগির ধরা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে---গার্লোসা নেপাল থেকে ব্যাঙ্গালোরে এসেছিল। সে দেবজিৎ সিনহা নামে পাশপোর্ট বানিয়ে নেপালে গা-ঢাকা দিয়েছিল। জনৈকা সিনেমা পরিচালক ও সমাজকর্মী নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে এক আধুনিক ফ্ল্যাটে তার বসবাসের বন্দোবস্ত করে দেন। আবার বীরবাহাদুর ছেত্রী নামে গার্লোসার একটি আলাদা নেপালী পাসপোর্টও পুলিশ উদ্ধার করেছে। ধারণা করা হচ্ছে ওই ভদ্রমহিলাই তাকে নেপালী পাসপোর্ট পেতে সাহায্য করেছিলেন। এদিকে অসমের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী মোহিত হোজাই-এর সঙ্গে গার্লোসার অবৈধ আঁতাত এবং যোগাযোগের প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ। ডি জি পি শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, মোহিত হোজাই ডি এইচ ডি (গার্লোসা) সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে ব্যাপক সরকারি অর্থ বারে বারে দিয়েছে। সেই অর্থ দিয়ে প্রচুর অত্যাধুনিক অস্ত্র কেনা এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন এবং গোপনে বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ব্যাপক পরিমাণ নগদ অর্থসহ মোহিত হোজাই ধরা পড়ে এখন গুয়াহাটি পুলিশের হেফাজতে। মোহিত হোজাই-এর মামলাও জাতীয় তদন্ত সংস্থার কাছেই রয়েছে। এবার জাতীয় তদন্ত সংস্থাই (NIA) গার্লোসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। শ্রীবাস্তব আরও জানিয়েছেন গার্লোসাদের দলের কাছে প্রচুর পরিমাণে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের মজুতভাণ্ডার রয়েছে। মিজোরামের জনৈক লিয়ানার মাধ্যমে তারা মায়ানমার থেকে চোরাপথে অস্ত্রশস্ত্র কিনেছে। বরাবর প্রকাশের আলোতে থাকার জন্য গার্লোসা তার দলের জঙ্গিদেরকে ট্রেন এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের আক্রমণের নির্দেশ দিত। গার্লোসার নামে ইতিমধ্যে আটটি মামলা ঝুলছে, আরও কয়েকটি যোগ হবে। তবে শ্রীবাস্তবকেও ডি এইচ ডি (গার্লোসা) অস্ত্রবিরতির অনুরোধ পাঠিয়েছে বলে তিনি

ডিজিপি শ্রীবাস্তব

জানান। তবে তিনি সরকারকেই এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রেটার নাগাল্যান্ড (স্বাধীন)-এর জন্য সংগ্রামরত এন এস সি এন জঙ্গিদের হাত ধরেই ডি এইচ ডি (ডিমা হালাম দাওগা)-র উত্থান প্রায় আট বছর আগে। স্বাধীন ডিমাসা রাষ্ট্রের অলীক স্বপ্নে, বন্দুক ও বোহেমিয়ান জীবনযাপন এবং প্রভূত অর্থের লোভে অনেক সরল ডিমাসা জনজাতি যুবকরা তাতে যোগ দেয়। পরে হিন্দু ও খৃস্টান দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় ওই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী---ডি এইচ ডি (নুনিসা) ও ডি এইচ ডি (গার্লোসা)। তাদের জন্মদাতা ও প্রশিক্ষণদানকারী এন এস সি এন জঙ্গিরা একেশাভাগই খৃস্টান। ডিমাসা জনজাতিরা সরল ও ধর্মপ্রাণ। তাদের খুব সামান্য ভগ্নাংশই খৃস্টমতে মতান্তরিত হয়েছে।

এদিকে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার বড় একটা এলাকাকে গ্রেটার নাগালিম-এর (বৃহত্তর নাগাল্যাণ্ড) অন্তর্গত করাতে চায় এন এস সি এন। এখন দেখার, নেতারা ধরা-পড়ার পর উত্তর কাছাড়ে জনজীবন স্বাভাবিক হয় কিনা। এদিকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ডিমাসা ও নাগা জনজাতিদের গ্রাম জ্বালানো কিন্তু অব্যাহত। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দু নাগা ও ডিমাসাদের পরস্পর লড়িয়ে দেওয়া।

শ্রীলঙ্কার তামিলদের দুর্দশা নিয়ে সরগরম তামিল রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। একটি ছোট্ট তথ্য। শ্রীলঙ্কা সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে, গত জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা সাত হাজার। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, প্রায় তিন লক্ষের কাছাকাছি একটি তামিল জনগোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে শ্রীলঙ্কায় জাতি সংঘর্ষের ঘটনায়। প্রকৃত সংখ্যাটা যাই হোক না কেন এ নিয়ে এখন সরগরম তামিল রাজনীতি। সেই রাজনীতির প্রধান কারবারী করুণানিধির ডি এম কে কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক হওয়ার দরুণ তার আঁচ ভালোভাবেই টের পাচ্ছে নয়াদিল্লী। অপর দিকে তামিলনাড়ু-কেন্দ্রিক আরও দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অম্বুমানি রামাডসের পি এম কে ও জয়ললিতার এ আই এ ডি এম কে এনিয়ে আসরে নেমেছে। এদের পাশাপাশি দুই জাতীয় দল কংগ্রেস ও বিজেপি'র তামিলনাড়ুর রাজ্যশাখাও শ্রীলঙ্কা সরকারের তামিল নিধনের নিন্দায় মুখর হয়েছে। তামিলনাড়ুর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই চাইছে, যুদ্ধাপরাধের জন্য শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে এবং সেনাপ্রধান লেফট্যানেন্ট জেনারেল শরৎ ফনেস্কাকে আন্তর্জাতিক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে।

এই রাজনৈতিক দলগুলির এই ধরনের দাবীর যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে। সমস্যার সূত্রপাত হয় যখন রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কাউন্সিল (United Nations Human Rights Council) বা U.N.H.R.C.একটি খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করে যাতে বলা হয়, মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করে শ্রীলঙ্কা সরকারের উচিত তাদের বিরুদ্ধে আসা যাবতীয় অভিযোগ খতিয়ে দেখা এবং যথাযথ বিচার করা। এমনকী এল টি টি ই'র সঙ্গে কলম্বোর যুদ্ধের অন্তিম মুহূর্তে UNHRC শ্রীলঙ্কা সরকারকে পরামর্শ দেয়, ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ভয়ঙ্কর পরিণতি না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের উচিত এখন থেকেই তার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু রাজাপক্ষের নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কা সরকার একে ভালোভাবে নেয়নি। তারা এর পাল্টা একটি খসড়া প্রস্তাব UNHRC-র উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, এর (শ্রীলঙ্কার) সার্বভৌমত্ব, দেশের ঐক্য এবং স্বাধীনতার বিষয়টিকে মাথায় রেখে কারুর (পড়ুন UNHRC) এ নিয়ে নাক গলানোর দরকার নেই। ওই প্রস্তাবে এও বলা হয়, নিজের দেশে উচ্ছেদ হওয়া মানুষজনের জন্য শ্রীলঙ্কা সরকার স্বয়ং পদক্ষেপ নেবে।

শ্রীলঙ্কা সরকারের এই অবাঞ্ছিত প্রস্তাব নিয়েই গোল বাধে তামিল অধ্যুষিত এ দেশের তামিলনাড়ুতে। তামিলনাড়ুর শাসকদল ও কেন্দ্রীয় সরকারের জোটসঙ্গী ডি এম কে প্রধান করুণানিধি এ বিষয়ে একটি চিঠি লেখেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে। সেই চিঠিতে তিনি লেখেন, "যদিও এটা একদিকে

জয়ললিতা

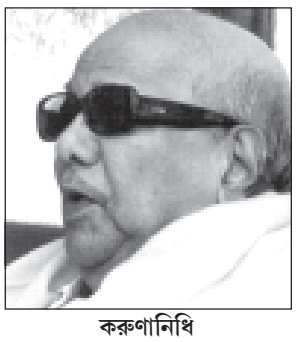

করুণানিধি

ঠিক যে যদি সার্বভৌমত্ব, দেশের ঐক্য ও স্বাধীনতার বিষয় হয় তবে শ্রীলঙ্কা সরকার একে অবশ্যই বিশেষ ঘটনা বলে দাবী করতে পারে। কিন্তু সারা বিশ্বে যেখানে যত তামিল রয়েছেন তারা খুবই আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করেন, UNHRC-এর খসড়া প্রস্তাবের পাল্টা হিসেবে শ্রীলঙ্কা সরকার যে প্রস্তাব গ্রহণ করতে চলেছে তা অবশ্যই শ্রীলঙ্কার তামিলদের স্বার্থবিরোধী। সেই কারণে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি শ্রীলঙ্কার তামিলদের সেন্টিমেন্টকে মাথায় রেখে এবং তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।"

অন্যদিকে এবার লোকসভায় একটি সীটও না জেতা পি এম কে'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অম্বুমানি রামাডসের বাবা এস রামাডস দাবী করেছেন, ভারত সরকারের অবিলম্বে শ্রীলঙ্কা সরকারের সেই খসড়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা উচিত। তিনি মনে করছেন, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে শ্রীলঙ্কা সরকার যেভাবে তামিল জাতিটাকেই বিলুপ্ত করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল তার মূল্য তাদের চোকাতেই হবে। আরও একধাপ এগিয়ে এস রামাডসের দাবী, "তামিল এবং সিংহলী একসঙ্গে আর শ্রীলঙ্কায় থাকতে পারবে না। এর একমাত্র সমাধান হতে পারে স্বতন্ত্র তামিল ইলম গঠনের প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক দলগুলির (শ্রীলঙ্কার) তা বোঝার সময় এসেছে।"

এদিকে বরাবরই করুণানিধির অবস্থানের ১৮০ ডিগ্রি বিরুদ্ধে থাকা তামিলনাড়ুর আম্মা তথা এ আই এ ডি এম কে নেত্রী জয়ললিতা জীবনে অন্তত একবারের জন্য হলেও, প্রায় করুণানিধির মতেরই শরিক হয়েছেন। তিনি মনে করছেন এতদিন পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় তামিলদের ওপর যে ধরনের অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে, এল. টি. টি. ই-র পরাজয়ে তা বন্ধ হবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। তিনি চাইছেন লঙ্কাদ্বীপের আইন সংশোধন করে নিশ্চিত

ত্রাণকার্য পরিদর্শনে মনমোহন বৈদ্য।

সুন্দরবনের মানুষ ভাবেইনি

আয়লা এত ভয়ঙ্কর

শ্যামাচরণ রায় ঃ ক্যানিং।। গত ২৫ মে ক্যানিং স্টেশনে দাঁড়িয়ে কয়েক হাজার মানুষের মতো আমিও দেখছিলাম। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে দোকানের সাইনবোর্ড থেকে শুরু করে গাছ, বিভিন্ন পোস্ট পড়তে শুরু করল। ভাবলাম একটু পরেই ঝড় থেমে যাবে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এলেও তখনও ভাবিনি যে এই ঝড়----আয়লা সুন্দরবন এলাকার মানুষকে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেবে। না হলে রাত্রি ৮ টার সময় কুলতলির কাঁটামারি থেকে গণপতি মিদ্যের করুণ আকুতি আসত না---'দাদা, শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করুন।' ক্যানিং সঙ্ঘ কার্যালয়ে সন্ধ্যা থেকে লোডশেডিং, মাতলা নদীর ওপারের কয়েকজনের সঙ্গে বসে খিচুড়ির আয়োজন চলছে। ঘটনা হল, এরা আজও ওপারে ফিরতে পারেনি। আর তখনই ফোন এল। সেই গলার আওয়াজ কাঁপছে। ওপার থেকে ভেসে এল, 'দাদা, আমি দৌড়াতে-দৌড়াতে কথা বলছি। শ্যামনগর প্রায় ডুবে গেছে। দক্ষিণ দুর্গাপুরের ধার পর্যন্ত জল এসে গেছে। কাঁটামারি স্কুলে অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন। গরু ছাগলের হিসেব নেই। আমার দোকানেও অনেককে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছি। কিছু শুকনো খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।' বললাম, রাত্রে তো গাড়ি যাবে না। কাল কিছু পাঠাবার ব্যবস্থা করব।' পরে শুনেছি সেদিনই অধিক রাত্রে চালে-ডালে খিচুড়ি বানিয়ে কিছু মানুষকে সারাদিন অভুক্ত থাকার পরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন গণপতি মিদ্যে। সর্বপ্রথম মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের কথা না ভেবে অপরের জন্য কিছু করার যে মানসিকতা সেটা রোগাপিটপিটে ওই লোকটিকে না দেখলে বোঝাই যাবে না।

গত ২৫ মে সোমবার দিনটি ছিল ভরা কোটালের দিন। সাধারণত এই সময়ে জলস্তরের উচ্চতা অনেক বেড়ে যায়। ২৪ তারিখ থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। গোসাবা, বাসন্তীর মানুষের অনেকের বক্তব্য এইরকম বিধবংসী জোয়ার ও ঝোড়ো হাওয়া তারা একসঙ্গে কখনও দেখেননি। সুন্দরবন এলাকায় ছোট- ছোট দ্বীপগুলি সাধারণত স্বাভাবিক জলস্তরের থেকে একটু ওপরে। চারিদিকে বাঁধ থাকার জন্য জল ভিতরে ঢুকতে পারে না। কখনও কখনও অল্প ঢুকলে গ্রামের মানুষ সেই বাঁধ মেরামত করে নেয়। দ্বীপের ভিতরে যে খাড়ি থাকে তাতেও নিয়মিত জোয়ারের জল প্রতিদিন ঢুকে থাকে, কিন্তু প্লাবনের সৃষ্টি করে না। দীর্ঘদিন ধরে বাঁধগুলো ঠিকমতো মেরামত না করার জন্য তা দুর্বলই ছিল। স্থানীয় নেতা, প্রশাসন ও বাঁধের ঠিকাদারদের যৌথ দুর্নীতি আজ ওই সমস্ত মানুষদের এই পর্যায়ের বিপর্যয়ের মধ্যে এনে ফেলেছে। নদীর জল যখন ঢুকতে শুরু করেছে বিভিন্ন স্থানে, হাজার হাজার মানুষ যেমন বাঁধ মেরামত করার চেষ্টা করেছে, সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণ নিয়ে কেউ উঠেছে স্থানীয় একমাত্র পাকাবাড়ি অর্থাৎ স্কুলে, কেউ গাছের উপরে পুরো পরিবার নিয়ে। গোসাবায় ত্রাণের কাজ করার সময় লাহিড়ীপুর অঞ্চলের বিধান কলোনী গ্রামে গিয়ে শুনলাম মা ছেলেকে নিয়ে স্কুলের ছাদে তিনদিন আশ্রয় নিয়ে থেকেছে। না জল, না খাদ্য। তার সঙ্গে ওইরকম বিপর্যয়। চারিদিকে নদীর জলের দাপট আর ঝড় কী যে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করেছে সেটা ওখানে গিয়ে যা দেখলাম তা লিখে বোঝানো যাবে না।

নদী আর নদী নেই, যেন মৃত্যুর পরোয়ানা। হাজার-হাজার মানুষ আর্ত চিৎকারে ভয়ার্ত ভবিষ্যতের মুখে দিশেহারা। তখন সুন্দরবনের সেই সুন্দর রূপ আর নেই। যেন মৃত্যুর বিভীষিকা। ঝড় কমল, বৃষ্টি থামল কিন্তু ওখানের মানুষের জন্য যে ভবিষ্যতকে রেখে গেল তার হিসেব কে নেবে? না হলে গেলাসখালি গ্রামের ভবিষ্যৎ তাদের কাঁদতে বারণ করেছে। নোনাজলে ভরে গেছে চারিদিক। পুকুরের মাছ, গোয়ালের গরু, ছাগল, কুকুর, সাপ, ব্যাঙ সব মরে পচে ভাসছে। লাহিড়ীপুর অঞ্চলের ধ্রুব (উৎসাহী যুবক, প্রাক্তন শিক্ষকের ছেলে) বলে, সে কয়েজনকে সঙ্গে নিয়ে ১৫০ টির বেশি এইসব পচাগলা লাশগুলোকে টেনে নিয়ে নদীর জলে ফেলেছে। এই অবস্থা গ্রামে গ্রামে। ছোট গ্রামের অস্তিত্ব আজ নেই। কোনও কোনও জায়গায় মাটির ছোট ঢিবি। দেখলেই বোঝা যাবে সদ্য ভাঙা ঘরের স্মৃতি চিহ্ন।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর— এই ব্লকগুলি বিধবস্ত হয়েছে 'আয়লার'প্রকোপে। তবে গোসাবা ব্লকের ক্ষতির পরিমাণ বেশি। ওই ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সবগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত। সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৯ টি অঞ্চল। (১) লাহিড়ীপুর, (২) সাতজেলিয়া (৩) গোসাবা, (৪) রাঙাখালি, (৫) বালি-১, (৬) বালি-২, (৭) কুমিরমারি, (৮) ছোট মোল্লাখালি, (৯) কচুখালি। ২৫-৭৫ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল— (১) রাধানগর (২) বিপ্রদাসপুর চণ্ডিপুর, (৩) আমতলি, (৪) শম্ভুনগর, (৫) পাঠানখালি। গোসাবার মোট লোকসংখ্যা ২১২১০৩ (২০০১ সালের হিসেব) জন। তাদের অধিকাংশই কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। লাহিড়ীপুর, কুমিরমারি অঞ্চল দুটির ৯০ শতাংশ বাড়ি ভেঙে গেছে। এখানকার ৭৫ শতাংশ মানুষের জীবিকা কৃষি, ২০ শতাংশের মাছ চাষ বা ব্যবসা, ৫ শতাংশ অন্য। বিদ্যা, করতাল, মাতলা, রায়মঙ্গল ইত্যাদি নদীগুলো পুরো ব্লকের দ্বীপগুলিকে ঘিরে রেখেছে।

বাসন্তী ব্লকেও ক্ষতি হয়েছে বহুস্থানে। তার মধ্যে রামচন্দ্রখালি, মোকামবেড়িয়া, মসজিদবাটি, ঝড়খালি অঞ্চল উল্লেখযোগ্য। কুলতলি ব্লকের ৯টি অঞ্চলের ৬টি ক্ষতিগ্রস্ত। ১৩০ টি গ্রামের অল্পবিস্তর ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গোপালগঞ্জ ও দেউলবাড়ি দেবীপুর অঞ্চল। এ ছাড়া গুড়বেড়িয়া, ভুবনেশ্বরী, মৈপিঠে বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রায়দিঘির মধ্যে নন্দকুমার ও জটারদেউল অঞ্চল ভালোরকম ক্ষতিগ্রস্ত।

পাথরপ্রতিমা ব্লকের বড় রাক্ষসখালি, ছোট রাক্ষসখালি, ব্রজবল্লভপুর-এর অবস্থা খুবই খারাপ। বিভিন্ন প্লট যেমন গু. ন. ল ইত্যাদি এলাকাগুলি খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নামখানা ব্লকের ৭টি অঞ্চলের ৫টি 'আয়লার' কবলে পড়েছে। কাকদ্বীপ ব্লকেরও ৩টি অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে রামরতনপুর সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। সাগরে সব থেকে কম ক্ষতি হয়েছে। ধবলাট অঞ্চলে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে।

কয়েকশত গ্রামের হাজার হাজার পরিবার আজ যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে তার চেয়ে ভয়াবহ আগামী দিন। পুকুরের মাছ, মাঠের ফসল, পানের বরজ যেমন এখনই শেষ হয় গেছে, সেইরকম আগামী কয়েকবছর ফসলও ফলানো যাবে না নোনাজলের প্রভাবে। চারিদিকে জল অথচ জলের জন্য হাহাকার। সে চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। আর্ত মানুষের ভয়ার্ত চিৎকারের দৃশ্য আজ বার বার মনে পড়ছে। সাতজেলিয়া অঞ্চলের গ্লাসখালি গ্রামের পাশ দিয়ে যখন বোট নিয়ে ত্রাণের কাজে যাচ্ছি, কয়েকশো মানুষ তখন নদীর ধারে জলের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে। কোনও ত্রাণের বোট দেখলেই আর্ত চিৎকার করে ডাঙার দিকে নৌকা ভেড়াবার জন্য ডাকছে।

আমাদের বড় বোট নিয়ে যখন সেখানে গেলাম, অবাক কথা শুনতে পেলাম। 'আমাদের ত্রাণের দরকার নেই। জল দিন, জল।' আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কয়েকবস্তা পাউচ প্যাকেট জল দিলাম। একজন বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমাদের জয় হোক, বাবা।'

লাহিড়ীপুর অঞ্চলের চরঘেরী ও বিধান কলোনী দুটি গ্রামের মাঝে যখন ত্রাণ নিয়ে গেলাম, সবাই ছুটে এল। কিছু চাল-ডাল পাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

চরঘেরীর একজন ভদ্রমহিলা কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, 'এই প্রথম কেউ এল বাবা কিছু নিয়ে।' চারিদিকের শ্মশানের নিস্তব্ধতার মধ্যেও ওই মায়ের করুণমুখ চিরদিন মনে থাকবে। কিছু ওষুধ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। জেলা কার্যবাহ সুকুমার নস্কর ব্যাগ ধরে ওষুধ বের করলেন। আমি ওষুধের নাম বলছি রোগ অনুযায়ী যা আগে থেকে লিখে নিয়ে গেছি। সবাই ভাবছে আমি ডাক্তার। তাদের সেই করুণ দৃশ্য দেখে সুকুমারদার চোখদুটো চিকচিক করে উঠল। সেদিন (২।০৬।০৯) আরও একটি গ্রামে কিছু জল দিয়ে এলাম।

আগে যে সমস্ত গ্রামে গিয়ে থেকেছি এখন সেই গ্রামের মানুষ রাস্তায় একটা বা দুটো প্লাস্টিকের ত্রিপল খাটিয়ে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। জিগ্যেস করছে, 'কেমন আছি?' আমি কিছু জিগ্যেস করতে পারলাম না, জানি তো বলবে, 'এই বেশ

(এরপর ১০ পাতায়)

আয়লা বিধ্বস্ত একটি গ্রাম।

নতুন দিশায় আয়েলা দুর্গতদের মাঝে সঙ্ঘের ত্রাণকাজ

অর্ণব নাগ।। যাঁরা 'আয়েলা দুর্গত' তাঁদের কাছে আর এস এস এবং বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির ত্রাণকাজের কোনও খবর পৌঁছে দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু যাঁরা সৌভাগ্যক্রমে সেই দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে খবরের কাগজ এবং টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে দুর্গতদের খবরা-খবর রাখছেন, তাঁদের কাছেই সঙ্ঘের ত্রাণকাজের খবরটা পৌঁছনো বিশেষ দরকার। এমনই এক স্পষ্ট ভাষণের সাক্ষী হয়ে রইল কেশব ভবনে আয়োজিত আর এস এসের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলন।

গত ২৫ মে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আয়েলা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়ার পর প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এবং কলকাতা। ওই সমস্ত এলাকার লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের আর্তনাদ বাঁধ ভেঙে প্লাবিত বন্যার জলে মিশে যায়। আয়েলা আছড়ে পড়ার অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও তার সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আসলে ত্রাণ বিলি-বন্টন নিয়ে প্রশাসনিক অপদার্থতা এবং রাজনৈতিক দলগুলির আকচাআকচি ও সর্বোপরি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেরই সদিচ্ছার অভাবে অধিকাংশ মানুষের কাছেই ত্রাণ সেভাবে পৌঁছতে পারেনি। বিশেষ করে বন্যাবিধ্বস্ত বেশ কিছু এলাকা যেমন হাসনাবাদ, ন্যাজাট, সন্দেশখালি মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সরকারি-বেসরকারি কোনও পক্ষেই ত্রাণ সেখানে পৌঁছতে পারেনি। এই অবস্থায় সঙ্ঘের দেওয়া ত্রাণের ভরসাতেই ওই সব এলাকায় দিন কাটিয়েছেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। সংবাদমাধ্যমের কাছে পুরো ব্যাপারটাই একটি ব্যবসায়িক লাভজনক 'খবরে' পরিণত হয়েছিল। ত্রাণ বিলি-বন্টন দেখানোর তুলনায় ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি দেখাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল সেইসব মিডিয়াকুল।

যে পরিকল্পনার অভাবে ঠিকঠাক ত্রাণ বিলি-বন্টন করতে পারেননি প্রশাসন, নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই ত্রাণ বন্টন করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আর এস এস। আর এস এস বরাবরই প্রচার বিমুখ। তাই আগে ত্রাণকাজ তারপরে অন্য সব কিছু---এই নীতি নিয়েই দুর্যোগের পরে পরেই প্রায় দিন পনেরো ত্রাণকাজের যাবতীয় দায়ভার একার কাঁধেই তুলে নিয়েছিল সঙ্ঘ। জনপ্রিয়তা বাড়ছিল। কিন্তু মিডিয়াতে উদ্দেশ্যপ্রাণোদিত ভাবে উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছিল সঙ্ঘের ত্রাণকাজ। প্রথমে আর এস এস নেতৃত্ব এনিয়ে গা করেননি তেমন। তাঁরা তাঁদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই নীরবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সরকারি প্রশাসন ত্রাণকাজ নিয়ে ক্রমাগত যে কৌশলগত অপদার্থতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছিলেন তা শোধরাবার উদ্দেশ্যেই শেষপর্যন্ত প্রেস কনফারেন্স ডাকতে বাধ্য হন সঙ্ঘ নেতৃত্ব।

গত ১০ জুন 'কেশব ভবনে' আয়োজিত হয় ওই প্রেস কনফারেন্স। শুরুতে আর এস এস-এর ত্রাণ কার্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ-কার্যবাহ প্রদ্যুৎ কুমার মৈত্র। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের বঙ্গ ক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সভাপতি অমরনাথ মুখোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক জীবনময় বসু। সংবাদ মাধ্যমের নিরপেক্ষতা কতটা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আর এস এস-এর ত্রাণকাজের চিত্রস্বলিত একটি সিডি মিডিয়ার উপস্থিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংবাদ মাধ্যম রোজই দেখাচ্ছে, হয় বুদ্ধিজীবীরা, না হয় মিডিয়ার লোকজন বা বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা কেউ না কেউ প্রতিদিনই ত্রাণ সংগ্রহ করছে। কিন্তু সেই সংগৃহীত ত্রাণ কতটা বিজ্ঞানসম্মত এই প্রশ্নটা কিন্তু সঙ্গত ভাবেই উঠে এসেছে সেদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে। সংবাদমাধ্যমের 'misinformation' ও 'disinformation'-এর দরুণ তাঁরা ত্রাণের কাজে ভুল পথেই এগোচ্ছেন।

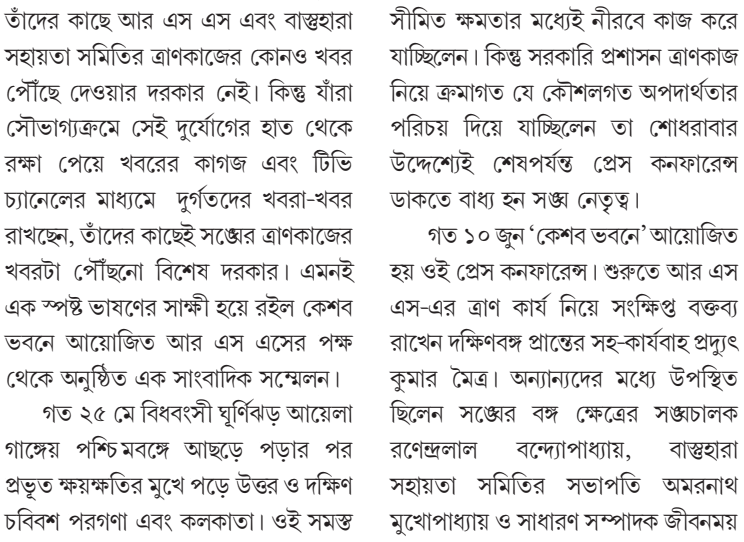

দুর্গতদের জন্য খাবার রান্না করা হচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, আর এস এস-এর কার্যকর্তারা এত বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন কি ভাবে?

এ প্রশ্নের একটাই জবাব হয়, ত্রাণকাজ সামলাতে গিয়ে যে রোমাঞ্চ কর ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা, সেই অভিজ্ঞতাই তাঁদের বাধ্য করেছে এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে। সংবাদ মাধ্যমে ত্রাণের ব্যাপারে যা শুনছি বা দেখছি আর তার সঙ্গে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরীখে বেশ খানিকটা খটকা রয়েছে। উপরিউক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে তা নিরসনেরও চেষ্টা করা হয়েছে। সেই খটকা ও নিরসনগুলি একনজরে দেখে নিলেই মালুম হবে, সঙ্ঘের ত্রাণকাজ কতটা সুব্যবস্থিত।

খটকা-১

যাঁরাই ত্রাণসংগ্রহ করছেন, সবাই শুকনো খাদ্য সংগ্রহে জোর দিচ্ছেন। অথচ বারংবার শুকনো খাবার অর্থাৎ চিড়ে, মুড়ি ইত্যাদি খেতে থাকলে পেটের সমস্যা অনিবার্য। যা হয়ে থাকলে আন্ত্রিক সহ অন্যান্য মহামারীর প্রকোপ বাড়বে।

কেশব ভবনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সহ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদ্যুৎ মৈত্র।

এর জন্য সঙ্ঘই প্রথম অনেক কষ্টে কাঠ কয়লা জোগাড় করে রান্না করা খাবার বিতরণ করে দুর্গতদের মধ্যে। ভিজে যাওয়া সেই কাঠ, কয়লাকে শুকনো করতে যে অনেক মেহনত করতে হয়েছে স্বয়ংসেবকদের তা বলাই বাহুল্য।

খটকা-২

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ত্রাণ বিলি সীমাবদ্ধ রয়েছে অপেক্ষাকৃত সুগম এলাকাগুলিতে। একেই ত্রাণ অপ্রতুল। তায় দুর্গম জায়গায় পৌঁছনোই দায়, তারপর আবার ত্রাণবিলি।

নিরসন-২

দুর্যোগের পরদিন অর্থাৎ ২৬ মে নৌকার মাঝি-মাল্লাদের প্রথমে অনুনয় বিনয় ও তারপরে একপ্রকার জোর করেই কালিন্দী, রায়মঙ্গলের মতো ঝড়ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বিপজ্জনক নদী পার হয়ে স্বয়ংসেবকরা পৌঁছে যান সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এরকমই একটি দুর্গম অঞ্চল ভেদ নগরে পৌঁছোনোর পর স্থানীয় মানুষের প্রতিক্রিয়া---'আমরা বেঁচে আছি, আপনারা জানলেন কি করে?' প্রথমে ওখানকার লোকেরা ভেবেছিল স্বয়ংসেবকরা বোধ হয় প্রশাসনের লোক। সেই ভুল ভাঙ্গতেই তাঁদের অভিমান নিমেষে উধাও। মুহূর্তে তুলে নিলেন স্বয়ংসেবকদের আনা জামাকাপড় ও খাদ্য সামগ্রী। সেখানে আজও প্রশাসন পৌঁছতে পারেনি।

খটকা-৩

এই মুহূর্তে দুর্গতদের ত্রাণে যে দুটি জিনিসের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হল নুন ও ব্লিচিং পাউডার। নুন প্রয়োজন দেহের ডি-হাইড্রেশন রোধ করবার জন্য এবং ব্লিচিং পাউডার প্রয়োজন আন্ত্রিক সহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য। অথচ এই দুটি জিনিসই নজর এড়িয়ে গিয়েছে ত্রাণকাজে নামা সবকটি সংগঠনের।

নিরসন-৩

আর এস এস-এর স্বেচ্ছাসেবকদের বলতে হয়নি। তারা প্রথমেই এ দুটি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বন্দোবস্ত করে।

খটকা-৪

আর এস এস ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা এই ত্রাণকার্যে নিয়োজিত তাদের অবস্থাও এই মুহূর্তে আয়লা-বিধ্বস্তদের মতোই। এক নাগাড়ে দিন পনেরো কাজ করে যাওয়ায় সেইসব স্বেচ্ছাসেবকদের শারীরিক হাল শোচনীয়। দুর্গতদের ত্রাণ দেওয়ার বদলে তাঁরা নিজেরাই এখন রোগে ভুগছেন। একই হাল তো হওয়ার কথা স্বয়ংসেবদেরও। তবে তা হল না কেন? উত্তরটা রয়েছে নিরসন-৪-এ।

নিরসন-৪

ওইসব স্বেচ্ছাসেবকদের হাল সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের হচ্ছে না। কারণ কিছুদিন অন্তর-অন্তর তাদের বদলি করে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। আশপাশের জেলা থেকে স্বয়ংসেবকরা এসে Reliefer-এর ভূমিকা নিচ্ছেন। এইভাবে Replacement-এর মাধ্যমে তাদের তরতাজা রাখার বন্দোবস্ত করে মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছেন সঙ্ঘ কর্তৃপক্ষ। এমনিতে আর এস এস ওইসব এলাকায় খুবই শক্তিশালী। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় মোট চল্লিশটি শাখা চলে তাদের।

খটকা-৫

সবাই 'কমন ফুড'-এর কথাই ভাবছে। শিশু খাদ্যের কথা কেউই ভাবছে না। সবাই পানীয় জলের কথা বলছে। কিন্তু তা পরিশোধিত কিনা তা নিয়ে মাথা-ব্যাথা নেই কারুর।

নিরসন-৫

আর এস এস-ই প্রথম শিশুদের মুখে তুলে দেয় দুধ ও বেবিফুড। জলে মেশানোর জন্য শহর থেকে নিয়ে যাওয়া জিওলিনও দিয়েছে।

খটকা-৬

এই দুর্যোগ জাতীয় বিপর্যয় কিনা কিংবা ত্রাণবন্টন কীভাবে হবে তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে চাপান-উতোর চলছে। তৃণমূল চাইছে, ত্রাণবন্টন হোক সরাসরি জেলা পরিষদ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। অন্যদিকে সিপিএমের দাবী ত্রাণবন্টন হোক সরাসরি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে। যাই হোক না কেন, একে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করলেই কি সব সমস্যা মিটে যাবে?

ইতিপূর্বে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ মনমোহন বৈদ্য সরেজমিনে বন্যা-দুর্গতদের ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। গত ৯ জুলাই পরিস্থিতির বিশদ বিবরণ শুনেছেন আর এস এস-এর সরকার্যবাহ ভাইয়াজী জোশী। এঁদের সক্রিয় উপস্থিতির কারণ দর্শালেন প্রদ্যুৎ মৈত্র, 'এই ভয়াবহ বিপর্যয়ে সারা দেশের স্বয়ংসেবকরা বাংলার মানুষের পাশে আছেন।'

আর কোনও খটকা নেই। শুধু দু-একটা তথ্য। এই ভয়াবহ দুর্যোগে কয়েক হাজার গবাদি পশুর মৃত্যু হয়। বাংলাদেশী হার্মাদদের সৌজন্যে তা মাংস হিসেবে পাচার হচ্ছিল বাংলাদেশে। সঙ্ঘের সহযোগিতায় গ্রামবাসীরা সেই অপচেষ্টা রুখে মৃত গরুগুলির সৎকার্যের বন্দোবস্ত করেন। জাতপাত, দলমত নির্বিশেষে ত্রাণকাজে সবারই অন্তিম ভরসার নাম এখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এ কাজে তাদের সহায়ক ১৯৪৯ সাল থেকে নীরবে সেবা কাজ করে আসা বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠন। ৮০জি ধারায় আয়কর মুক্ত বাস্তুহারা সহায়তা সমিতিতে ত্রাণ কাজের জন্য দান করতে পারেন আপনিও। ত্রাণ পাঠানোর ঠিকানা---বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি , ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬

মিশন বিক্রেতা, সি পি এম ক্রেতা

মেদিনীপুরে রামকৃষ্ণ মিশনকে ০.৩৫২৯ একর জমি দান করেছিলেন রাজা প্রবীর সিংহ গজেন্দ্র মহাপাত্র। উদ্দেশ্য মেদিনীপুর শহরের সেখপুরা মৌজায় জে. এল নং১৭২, আর. এস. খতিয়ান ৭২, এল. আর. খতিয়ান ৩২০তে ০.৩৫২৯ একর জমিতে অনাথরা আশ্রয় পাবে। সেই জায়গায়ই আজ সি. পি. এমের দৌলতে অনাথ হয়ে দীপক সরকারের আশ্রয়ে স্থান পেয়েছে, গত ৩০-৩-০৯ তারিখ থেকে। টাকা মাটি-মাটি টাকার সম্প্রদায়রা তাই অতি সহজে দানকৃত জায়গাটি বিক্রি করে টাকা জমা করে। অনাথদের শেষ আলো অন্ধকারে ভরে দেয়। বিষয়টি ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে দুঃখজনক। তবে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আড়গ্রাম হিন্দু মিশনকে ঝাড়গ্রামের রাজা-রাজবাহাদুর ১.১৫ একর জমি দান করে। ফলে হিন্দু মিশনের জায়গা হয় ২.৯০ একর। জঙ্গলমহল মৌজায়-৩৩৪ খতিয়ান ১৬৪৯ কথা-১.৭৫ একর জমি মিশনের ও মিশন স্কুলের জন্য ওই মৌজার ৩৩৩ খতিয়ান-১.১৫ একর জায়গা আজ আর নেই। অনেকটাই হাত বদল হয়ে গেছে।

১৯৯৫ সালের ৮ জুন "হিন্দু ডিফেন্স অ্যান্ড রিহাবিলিটেশন ট্রাস্টের" পক্ষে অপূর্ব মণ্ডল, অমরনাথ দাস, তরুণকান্তি ঘোষ, দেবীদাস নিয়োগী, সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, হিজল চট্টোপাধ্যায়, অর্পিতা নিয়োগীগণ হিন্দুদের সর্বনাশ করতে ৫৫নং মির্জাপুর স্ট্রিটের (কলকাতা) ৫তলা বাড়িটি যা প্রায় ৭ কাটা ১৪ ছটাক ২৩ বর্গফুটের মতো জায়গায়, তা, কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নামে সি.পি.এম. ক্রয় করে নেয় মাত্র ১৭ লক্ষ টাকায়, যদিও এ বিষয়ে কয়েকজন দেশব্রতী মানুষের উদ্যোগে মামলা হয়েছে। কিন্তু কোনও এক অপশক্তির দৌরাত্ম্যে মামলাটি বিচার পর্যায়ে সঠিক পথে আসছে না।

এভাবে কমিউনিস্টদের হাত ধরে হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্থার সর্বনাশ বারবার হচ্ছে।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই, ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর

নিজস্ব সংবাদমাধ্যম

আমি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বেলিয়াতোড় গ্রামের একজন বিজেপির কর্মী। সেকারণে আমি বিজেপির নীতি আদর্শ এবং বিজেপির অনেক নেতাকেই শ্রদ্ধা করি এবং ভালোবাসি।

আজ দেশের বিপদ এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ (হিন্দু) তারা কী ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে এগিয়ে চলেছে সেটা সম্পূর্ণভাবে জানি বলে মনে খুব দুঃখ পাই এবং পরিণতির কথা ভেবে আতঙ্কিত হই।

একদিকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে মুসলিম জনসংখ্যা অস্বাভাবিক-ভাবে বেড়ে চলেছে এবং তার সঙ্গে সমগ্র ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে মুখোশধারী ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষাবাদীদের মদতে অবিরাম অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। আজ এদেশে সাড়ে তিন কোটির মতো মুসলিম অনুপ্রবেশকারী। এব্যাপারে সমস্ত সংবাদপত্র এবং সংবাদমাধ্যম নিশ্চুপ। এর ফলে এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার কারা তা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

সদ্য লোকসভা ভোটে এরাজ্যের প্রতিটি কাগজ এবং টিভি চ্যানেল হিংস্র নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজেপির ওপর। সেখানে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ প্রার্থীদের কথা (তাদের মিছিল, মিটিং, হাঁটাচলা, প্রতিশ্রুতি) সব প্রচার হতে লাগল। শুধুমাত্র বিজেপি প্রার্থীদের কথা বাদ দিয়ে। আমি জানি এরাজ্যে প্রচারে আদবানী তিনবার, হেমামালিনী দুবার, অর্জুন মুণ্ডাও একদিন প্রচারে এসেছিলেন। আরও অনেক নেতা-নেত্রী এসেছেন। কিন্তু তাও সঠিক জানতে পারিনি। বিজেপির জনসভায় কেমন লোক হয়েছিল, তারা কি বলে গেল তা কোনও বাজারি কাগজে আনেক খুঁজে বার করতে হয়েছে বা অনেক ক্ষেত্রে জানতেও পারিনি। দেখুন ট্র.ত্ব.ভ.-এর গণশক্তি, শিবসেনার 'সামনা' এবং আরও অনেক আঞ্চলিক দলের দৈনিক মুখপত্র রয়েছে। অথচ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, ভারতীয় জনতা পার্টির কোনও দৈনিক পত্রিকা নেই কেন? এর সঙ্গে প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষায় একাধিক বৈদ্যুতিন মাধ্যম (বিজেপির নিজস্ব) গড়ে তোলার কথা বলছি। আমার মনের কথা যদি আপনারা স্বস্তিকার মাধ্যমে আমাদের বিজেপির কর্ণধারদের কাছে পৌঁছে দেন এবং আমার স্বপ্ন সফল হয়, তাহলে আমার বিশ্বাস বিজেপিকে আর কোনও ষড়যন্ত্র রুখতে পারবে না।

বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বিদেশী শক্তি (আমেরিকা, ইতালি, ইংলন্ড প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্র) যাদের নিরন্তর চেষ্টা ভারতবাসীদের খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। কোনও রাজ্যে শক্তিশালী বিজেপি থাকলে সেটাতে বাধা আসছে।

অপরদিকে সৌদি আরব, ইরান, কুয়েত প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিও নিরন্তর টাকা ঢালছে। উদ্দেশ্য---এইসব সংবাদ মাধ্যমগুলি যাতে দেশের বৃহত্তম হিন্দু সমাজকে তাদের বিপদ সম্বন্ধে অবহিত না করতে পারে বা হিন্দু সমাজ সংগঠিত না হতে পারে।

---রূপক সেন, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া

মিডিয়ার অপপ্রচার

পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। বিভিন্ন মিডিয়া এটাকে যে আঙ্গিকে বিদেশিনী বধূ সোনিয়া এবং তার পোঁ-ধরা মনমোহন সিংকে নিয়ে প্রচার এবং ভজনায় মেতেছে, সেটাকে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, বিভিন্ন মিডিয়ায় বারবার এটা প্রচার করা হচ্ছে যে, বিজেপি এবারের লোকসভা নির্বাচনে একেবারে শেষ হয়ে গেছে। যেটা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা প্রচার। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বিজেপি সেখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে।

মিথ্যাচার বামপন্থী এবং কংগ্রেস দল বারবার সাধারণ ভোটারদের মনে একটা ধারণার জন্ম দেবার চেষ্টা করেছে যে, বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল এবং এই দল ক্ষমতায় এলে দেশের সর্বনাশ। তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কেন্দ্রে বিজেপির পাঁচ বছরের শাসনকালে দেশের সঠিক উন্নতির যে জয়ধারা, তা আজও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে বিজেপি সাম্প্রদায়িক এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়ার কৌশল খুবই পুরোনো এবং ভিত্তিহীন।

এইসব সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলের কাছে একটা কথা পরিষ্কার করে বলে দেওয়ার সময় এসেছে যে, এই নির্বাচনের ফলাফল দেখে তারা যেন ভেবে না বসেন, বিজেপির মতো একটা ঐতিহ্যশালী দল শেষ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে 'তারা' আবার স্ব-মহিমায় ফিরে আসবে।

—সুশান্ত কুমার দে, কলকাতা-১০৩

প্রসঙ্গ বরুণ গান্ধী

গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তির সবরকম স্বাধীনতার মধ্যে বাক্-স্বাধীনতাও থাকা আবশ্যক। এমতাবস্থায় বরুণ গান্ধী হিন্দুদের হয়ে কিছু কথা বলার জন্য তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু এইরকম উক্তি যদি অন্যদের জন্য করতেন তাহলে নিশ্চয় ধর্মনিরপেক্ষ বলে তাঁকে হয়তো পুরস্কৃত করতেন আমাদের সেকুলারবাদী নেতা আমলারা। কারণ একজন মুসলমান মরলে যেভাবে হৃদয়ে লাগে, দশজন হিন্দু মরলে তাঁর একভাগও দুঃখ হয় না ওইসব নেতাদের। কারণ, ওইসব নেতারা ক্ষমতালিপ্সু, দাগী ভ্রষ্টাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ যদি না হয় তবে কেন তারা এক বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণে সদা ব্যস্ত থাকে? কেন হিন্দুর পক্ষে কথা বললে সাম্প্রদায়িক বলে চিৎকার করে উঠেন? কেন হিন্দুর ওপর অত্যাচার হলে চুপ করে থাকেন? কেন আদালত অমান্য করে ফাঁসির আসামী আফজলকে আজও ফাঁসি দেননি? কেন কাশ্মীরি হিন্দুরা শরণার্থী রূপে দিন কাটাচ্ছেন নিজদেশে? কেন অনুপ্রবেশ ইস্যুতে নরম মনোভাব? কেন উগ্রবাদীরা সবসময় হিন্দু হত্যা করা সত্ত্বেও এই নেতারা মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন? এই যাদের চরিত্র তারা কিভাবে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে গলা ফাটিয়ে বলতে পারেন?

এইভাবে চলতে থাকলে হিন্দুদের একদিন নিজগৃহে থেকে পরবাসীর জীবন কাটাতে বাধ্য হতে হবে।

শ্যামলকান্তি নাথ, উত্তর কাছাড়, অসম

আয়লা এত ভয়ঙ্কর

(৮ পাতার পর)

ভালো আছি।' চণ্ডীপুর গ্রামে ত্রাণসামগ্রী দিয়ে ফিরে আসছি। এক বোন বলল, 'থাকুন।' আমি বললাম, 'পরে এসে থাকব রে!' কিই বা বলি। যে পরিমাণে ক্ষতি তার তুলনাই ত্রাণ সামান্যই।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সত্যিই তুলনা নেই। ক্ষীরোদ মহারাজের নেতৃত্বে গোসাবা, বাসন্তী এলাকায় ত্রাণ কাজ চলছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মোল্লাখালি (গোসাবা), গদখালি (গোসাবা, বাসন্তী) ব্রজবল্লভপুর (পাথরপ্রতিমা) এই সমস্ত এলাকায় রান্না খাবার সহ অন্যান্য ত্রাণ তাঁরা দিচ্ছেন। সঙ্ঘের ছত্ম.ত্র.ত্রগ্ন বহু স্বয়ংসেবক বিভিন্ন স্থানে সহযোগিতা করছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা, 'বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি'র নামে বিভিন্ন স্থানে ত্রাণের কাজ করে চলেছে। কোথাও রান্নাকরা খাবার, কোথাও শুকনো খাবার, চিকিৎসা শিবির, জলের ব্যবস্থা, ত্রিপল, পোষাক এইরকম ৩২ রকম সামগ্রী ত্রাণের কাজে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি এলাকায় কয়েকশো স্বয়ংসেবক এই কাজ করে চলেছে। কেউ পুরো সময়টাই সেখানে রয়েছে। কেউ বা আংশিক। কুলতলি এলাকায় সঙ্ঘের মহকুমা কার্যবাহ জয়দেব নস্কর, গোসাবা, সোনাখালি এলাকায় জেলা প্রচারক বিজয় পাতর, বৌদ্ধিক প্রমুখ সঞ্জয় সিনহা, মহকুমা কার্যবাহ ভোলানাথ বর্মন, দীপক নস্কর ও বাপী রায়ের মতো অনেকেই ত্রাণের কাজকে ধ্যানজ্ঞান করে কাজ করছেন।

এখনও (৪।০৬।০৯) পর্যন্ত ব্লকে ৪টি অঞ্চলের ২৬টি গ্রামে, গোসাবা ব্লকের ৫টি অঞ্চলের ১৩টি গ্রামে, বাসন্তী ব্লকের ৩টি অঞ্চলের ১৫টি গ্রামে ত্রাণের কাজে স্বয়ংসেবকরা পৌঁছে গেছে। নামখানা ব্লকের ১টি গ্রামে, পাথরপ্রতিমার ৪টি গ্রামে এই কাজ হয়েছে।

প্রতিদিন নতুন অঞ্চলের নতুন গ্রাম এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বাস্তুহারার ব্যানারে সেবা কাজে এগিয়ে এসেছেন। বহু যুবক দিনরাত্রি এইকাজে সহযোগিতা করছে যাদের সঙ্ঘ সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না।

অনেকে স্থানীয়ভাবে ত্রাণ সংগ্রহে নেমেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন মুসলিম প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মুসলিম এলাকায় ত্রাণ দিচ্ছে। সরকারী ত্রাণ সব জায়গায় অপ্রতুল। সেই সঙ্গে প্রশাসনের আগ্রহের অভাব চোখে পড়ার মতো। অথচ রাজনৈতিকভাবে ও প্রচারের দিক দিয়ে ফায়দা তোলার জন্য অনেকে দারুণভাবে সক্রিয়। সদ্য ভোট যুদ্ধে জয়লাভ করা এক পার্টির স্থানীয় নেতা তাদের বিশাল তাঁবুতে (গদখালি-গোসাবা---যার চারিদিকে পতাকা ভর্তি) সেখানে সারাদিন বসে থাকেন তার সঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে আর খাওয়ায় সময় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শিবিরে আসেন। তাঁকে খাওয়ার পরে জিগ্যেস করলাম, 'আপনাদের পার্টি থেকে কি সাহায্য করছেন?' তিনি বললেন, 'অনেক কিছু।' বললাম, 'দেখুন, আমার সব জায়গা চেনা, কোথায় কি করছেন?' উনি বললেন, 'আমরা বাইরে থেকে যাঁরা ত্রাণ দিতে আসছেন তাদের কোথায় তা দিতে হবে বলে দিচ্ছি।' থাকতে পারলাম না, ঠোঁটে কাটার মতো বলে ফেললাম, 'কই, কেউ তো জিগ্যেস করছে না। আর আপনারা সরকারি পার্টির দোষ দিচ্ছেন আর নিজেদের প্রচার নিচ্ছেন বেশ।' উনি হঠাৎ বললেন, 'জানেন তো, রাজনৈতিক নেতাদের এ ব্যাপারে সেন্স খুব কম হয়।' এই একটা কথাতেই আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রচার মাধ্যমে সবাই জানতে পারছেন কিভাবে 'আয়লা' নিয়ে দলবাজি চলেছে। নিজের দম্ভে গর্বিত শাসককুল আজ গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। মানুষের আর্তনাদের থেকেও তাদের ভয় জনগণের পিটুনি। মন্ত্রীদের এই রকম কেঁচোর মতো ব্যবহার এর আগে কখনও দেখিনি।

আমরা যখন ২৫-৩০ জন স্বয়ংসেবক একটা বড় বোটে (যেগুলো সুন্দরবন বেড়ানোর জন্য ব্যবহার হয়) পানীয় জল, চাল, ডাল ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে লাহিড়ীপুর অঞ্চলের চারঘেরী ও বিধান কলোনীর দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন স্থানীয় মন্ত্রী চার-পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে খালি বোটে কোথাও যাবেন তার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমাদের একজন স্বয়ংসেবক ওই বোটে লাফিয়ে উঠে গিয়ে হাসতে-হাসতে বলছে, 'ছবি তুলুন'। আমরা ডেকে নিলাম। মন্ত্রীমশাই শুকনো মুখে তাকিয়ে আছেন। বাম রাজত্বে বাম মন্ত্রীর সেই করুণ দৃষ্টি কখনও ভুলব না। পরে বললাম, 'হাফপ্যান্টের স্বয়ংসেবকের ছবি পাশে থাকলে তাঁর মন্ত্রীত্বই কাল চলে যাবে।' আসলে মাত্র দু'দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী যেদিন গোসাবার দিকে আসেন সেদিনই বিডিও সাহেব জনগণের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন। নিত্যনতুন স্থানে বিভিন্নস্তরের নেতাদের নিগৃহীত হওয়ার খবর আসতেই থাকছে।

সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষই রাজনীতি করবে, কিন্তু ওই নিরাশ্রয় মানুষদের কথা মানুষ হিসাবে ভাববে না, ভাববে রাজনৈতিক জীব হিসাবে। এই ভাবনার পরিবর্তন না হলে যতই হাজার হাজার কোটি টাকা আসুক না কেন, সুন্দরবনের সুদর্শন, ধ্রুব, কৈলাশ সবাইকেই বছর বছর আসন্ন নরক যন্ত্রণার জন্য দিন গুণতে হবে। সুরাহা কিছু হবে না।

সনাতনী শিক্ষা

ভবিষ্যৎ পুরাণের সিদ্ধান্ত

রবীন সেনগুপ্ত

ঈশ্বর দেহধারণ করার সময় কামক্রোধ গুণ সমেত আবির্ভূত হন। ২২ অধ্যায়

মূল সংস্কৃত শ্লোক ঃ দেহাবেশাদীশ্বরস্য কামাদ্যা দৈহাকা গুণাঃ

তাৎপর্য বিশ্লেষণ ঃ আমাদের চেনা পরিচিত অনেকেই বলেছেন যে ঠাকুরের নাম ধ্যান শুরু করার পর থেকে তাদের শোক-কাম-ক্রোধ অনেক কমে গিয়েছে। বাস্তবে তার প্রকাশও তারা আমাদের দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে যাদের নাম ধ্যান করে আমাদের শোক-কাম-ক্রোধ কমে আসে তারা নিজেরাই অনেক সময় আশ্চর্য আচরণ করে গেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের সীতাদেবীর বিরহে দীর্ঘ শোকবিলাপ, শ্রীকৃষ্ণের ষোলো হাজার একশো আট মহিষীর সঙ্গে নিয়মিত রতি মিলন ও সন্তানসন্ততি উৎপাদন, পরশুরাম, বলদেব প্রমুখের চরম ক্রোধ প্রদর্শন---- আমাদের আশ্চর্য করে দেয়। এই শ্লোকটি থেকে জানা যাচ্ছে যে ঈশ্বর-কোটির পুরুষেরা কাম-ক্রোধ-গুণ

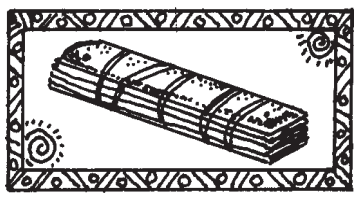

সমেতই আবির্ভূত হন। কারণ তাদের নানারকম লীলা করে লোকশিক্ষা দিতে হয়, অশুভ শক্তিদের বধ করতে হয়, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, ধর্মের পথের দিকে। তারা যদি নিরীহ, নির্বিকার, শীর্ণ দেহী, নিষ্কাম, ক্রোধহীন সাধুদের মতো বসে বসে ধ্যান করেন, তাহলে যথেষ্ট লীলা প্রদর্শন সম্ভব হবে না। তাই তারা কামাদি গুণ সমেত অবতীর্ণ হন। একজন অভিনেতা নিজে খুব ধীর স্থির শান্ত হতে পারেন, কিন্তু মঞ্চে বা চলচ্চিত্রে ওই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করলে কজন আকৃষ্ট হবেন? তাই সেখানে তাকে নৃত্যগীত পটু, হাস্য ও রতিরস পটু, যোদ্ধা চরিত্র হিসাবে অবতীর্ণ হতে হয়। অবতারদের ব্যাপারটিও অনেকটা তাই।

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ২০০.০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যেকোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে—

Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন।

— ব্যবস্থাপক

পরম্পরা

সোমনাথ নন্দী

আজও হিন্দুদের সুদৃঢ় বিশ্বাস জগন্নাথের মহাপ্রসাদ পরম মোক্ষদায়ী

বিশ্বের হিন্দু বলয়ে তিন বস্তুর মর্যাদা অপরিসীম। তারা মহার্ঘ বা চিন্ময়রূপে গণ্য। চিন্ময় অর্থাৎ যার মধ্যে সর্বদা স্পন্দিত ব্রহ্মশক্তি।

এই ত্রয়ী বস্তু হল গঙ্গাবারি, বৃন্দাবনের রজ আর জগন্নাথের মহাপ্রসাদ। যুগ-যুগান্ত ধরে এই তিন বস্তুর দিব্য মর্যাদায় কোনও ছেদ ঘটেনি। বিভিন্ন সময়ে এই দেবভূমিতে আগত ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষরা শতমুখে গুণগান গেয়েছেন এই তিন বস্তুর।

কলির দুই পাবনাবতার মহাপ্রভু শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ তিন বস্তুর মহিমা বিষয়ে মুখর হয়েছেন নানাভাবে, এমনকী সাম্প্রতিক কালের সন্তদাস কাঠিয়াবাবা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহাযোগী দেবরহা বাবা প্রমুখ উচ্চকোটির সন্তগণও তিন বস্তু বিষয়ে সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ প্রায়শই ভক্তদের বলতেন---গঙ্গার জল জলের মধ্যে নয়, বৃন্দাবনের রজ ধূলির মধ্যে নয়, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ অন্নের মধ্যে নয়। এরা ব্রহ্মবস্তু।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব তাঁর মর্ত্যলীলায় মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন একটু অন্যভাবে। নীলাচলে অবস্থানকালে তিনি একবার মহাপ্রসাদ নিয়ে যান রাজপণ্ডিত ও নিজ পরিকর বাসুদেব সার্বভৌমের গৃহে। সার্বভৌম পণ্ডিত তখন নিদ্রায়। মহাপ্রভু তাঁকে জাগিয়ে সামান্য মহাপ্রসাদ দেন তাঁর হাতে। মহাপ্রভুর করকমল স্পর্শিত সেই মহাপ্রসাদ পেয়ে হর্ষিত সার্বভৌম। তৎক্ষণাৎ তা মুখে ফেলে পদ্মপুরাণের একটি শ্লোক আবৃত্তি করে শোনান মহাপ্রভুকে।---শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ / প্রাপ্তিমাত্রেন ভোক্তব্যং না একালবিচারনা। অর্থাৎ মহাপ্রসাদ শুষ্ক বা বাসি হোক বা দূরদেশ হতে আসুক, পাওয়া মাত্র গ্রহণ করতে নেই।

মহাপ্রসাদ যে চিন্ময় বস্তু তা মহাভাগবত নামাচার্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের একটি ঘটনায় ফুটে ওঠে।

হরিদাস ঠাকুর জাতিতে যবন। নাম জপের গুণে তিনি মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন তাঁর জন্য ভক্ত গোবিন্দ মারফত মহাপ্রসাদ পাঠাতেন। তিন লক্ষ নাম জপ হরিদাসের নিত্য কর্ম ছিল। তখন তিনি বৃদ্ধাবস্থায়। সেদিনও গোবিন্দ এসেছিল মহাপ্রসাদ নিয়ে। আস্তে আস্তে জপ করছেন হরিদাস ঠাকুর, শয়নাবস্থায়। তিন লক্ষ জপ শেষ হতে তখনও বাকি। গোবিন্দর হাতে মহাপ্রসাদ দেখে আনন্দিত হরিদাস ঠাকুর। বললেন---মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব (চৈ. চ. ২।১১।১৫)। এই বলে জপ সংখ্যা শেষের আগেই মহাপ্রসাদ মুখে দিলেন। লঙ্ঘন করলেন নিজ সংকল্প। রাখলেন মহাপ্রসাদের মর্যাদা।

প্রশ্ন আসতে পারে কেন মহাপ্রসাদ চিন্ময়। কেন তাঁর এত মহিমা কীর্তন। কারণ অবশ্য ক্ষেত্র মাহাত্ম্য। সর্বোপরি ক্ষেত্রাধিপতির অসীম মহিমা। সমস্ত পুরাণ এবং বিভিন্ন হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে ভগবান পুরুষোত্তমের সহস্রমুখে গুণকীর্তন। শাঙ্খায়ণ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে আদিকাল হতে সিন্ধু তীরে যে দারুমূর্তি বিরাজ করছে তার আরাধনায় লাভ হয় পরমধাম। একইভাবে কপিল সংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে---সর্বেষাং চৈব ক্ষেত্রানাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তম/সর্বেষঞ্চৈ ব দেবানাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তম। শাস্ত্রসমূহে যাঁয় এই অভিধা, তাঁর প্রসাদ যে মহাপ্রসাদ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জগন্নাথের মহাপ্রসাদকে কেন্দ্র করে একটি কাহিনী আছে জগন্নাথ সারাবলীতে। কাহিনীটি এইরূপ।

পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণ প্রতিদিন বৈকুণ্ঠে দেবী লক্ষ্মীর হাতে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ করেন। সেদিনও তাই। এমন সময় বিষ্ণুভক্ত দেবর্ষি নারদের আবির্ভাব সেখানে। প্রভুর আহারান্তে ভুক্তাবশিষ্ট আপন আহারের জন্য লক্ষ্মীদেবী নিয়ে যাচ্ছেন অন্দরে। নারদ তখন সেই প্রসাদের

মধ্য কলকাতার জানবাজারে উমাদাস লেনে ৩০০ বছরের জগন্নাথ বিগ্রহ।

কিছু অংশ প্রার্থনা করলেন। দেবী রাজী নন। প্রসাদে একমাত্র তাঁর অধিকার। দেবর্ষির অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হল। উপায়ান্তর না দেখে তিনি দেবীর সখীরূপ ধারণ করে তাঁকে সেবায় তুষ্ট করলেন। দেবী তাঁকে বর দিতে চাইলেন। সখীরূপী নারদ পরে নেবেন বলে দেবীকে সেদিনের মতো নিরস্ত করলেন। পরদিন নারায়ণের আহার শেষে দেবী কমলা খেতে বসবেন। নারদ সুযোগ বুঝে বরদানের সংকল্প স্মরণ করিয়ে প্রভুর প্রসাদ চাইলেন। দেবী হরিপ্রিয়া তখন নিরুপায়। একদিকে সত্যবাক্য, অন্যদিকে শ্রীপতির কাছে সংকল্প।

সমস্যার সমাধান করলেন সখীরূপী নারদ। বললেন, আপনি প্রভুর প্রসাদ যতটা নেবেন অন্য পাত্রে রেখে দিন। অবশিষ্ট আমায় দিন। কারণ প্রসাদ কণিকামাত্র যথেষ্ট। তাই করলেন দেবী। এবার নারদ স্বরূপ ধারণ করে গ্রহণ করলেন প্রসাদ। তারপর মহাভাবে নৃত্য করতে করতে চললেন কৈলাস অভিমুখে। নারদের মহাভাবের স্ফূর্তি দেখে চমৎকৃত কৈলাসপতি মহেশ্বর। ভাবছেন তিনিও তো সর্বদা শ্রীহরির ধ্যানে মগ্ন। তিনি তো এই অবস্থা লাভ করতে পারেননি। তাহলে! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন নারদকে। নারদ সব ঘটনা বললেন। শিব অনুযোগের সুরে তখন বললেন---এমন দুর্লভ বস্তু থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করলে। নারদ অপ্রস্তুত। কি করে দেবেন সেই মহাপ্রসাদ। শেষে দেখলেন নখের মধ্যে লেগে আছে সামান্য প্রসাদ। তাই দিলেন। সে প্রসাদ পেয়ে ভগবান পিনাকপাণি মহাভাবগ্রস্ত। শুরু করলেন তাণ্ডব নৃত্য।

পতির নৃত্য দেখে বিস্মিত দেবী পার্বতী। নারদ তাঁকে সব বললেন ঘটনা। গিরিরাজনন্দিনী এবার নিজে ক্ষুব্ধ। তাঁকে পতি এমন দুর্লভ বস্তু থেকে বঞ্চিত করলেন। শুনে উমাপতি বললেন,---"এই দ্রব্য ভক্ষণের যোগ্য তুমি নহ।" শুনে দেবী ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন---বেশ এই কথা। কলিতে আমি শ্রীক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে সেই প্রসাদের অধিকারী সকলকে করব। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ থাকবে না। সকলের এতে সমান অধিকার থাকবে। জগন্নাথদেবকে নিবেদনের পর সেই প্রসাদ আমায় নিবেদন না করলে তা গ্রহণের অযোগ্য হবে। আমায় নিবেদনের পর তা হবে মহাপ্রসাদ।

ভারতের প্রায় সব মন্দিরে অন্নপ্রসাদ প্রস্তুত হয়। তাদের পরিচয় একমাত্র প্রসাদ। কিন্তু জগন্নাথদেবে নিবেদিত সব অন্নব্যাঞ্জন মহাপ্রসাদ রূপে গণ্য হয়। মহাপ্রসাদ বলার কারণ দুটি। প্রথমটি হল জগন্নাথকে বলা হয় মহাভুজ। বিশাল প্রসারিত হস্তদ্বয় তাঁর। আর তিনি মহান প্রভু। তাই তাঁর প্রসাদ মহাপ্রসাদ।

দ্বিতীয় কারণ। জগন্নাথের প্রসাদ 'মা-প্রসাদ'। অর্থাৎ জগন্নাথে নিবেদনের পর তাঁর অন্নের থালা দেবী বিমলাকে নিবেদন করা হয়। তারপর সেই অন্ন অন্যান্য পাত্রে অন্ন ও ব্যঞ্জনাদিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তখন হবে মহাপ্রসাদ। এরপর তা জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বিতরণ করা হবে।

জগন্নাথের এই মহাপ্রসাদের মহিমা বহু সাধক, কবি নানাভাবে কীর্তন করেছেন। নীলাদ্রিনাথের পরম মুসলমানভক্ত সালবেগ তাঁর রচিত গাথায় গেয়েছেন---চল যাই পুরীধামে। সেখানে বাইশ পহচায় (মন্দির পূর্বদ্বারের সোপান) বসে গ্রহণ করি মহাপ্রসাদ। আমাদের অন্তরকে পূর্ণ করে।

শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ মন্দিরে ভোগ হয় মোট ছয় বার। দু-প্রকারের ভোগ। কোঠ ভোগ আর ছত্রভোগ। কোঠভোগ হয় পুরীর রাজা ও প্রশাসনের তরফে। আর ছত্র ভোগ দেয় পুরীর বিভিন্ন মঠ ও ভক্তগণ। ভোগ হয় ৫৬ প্রকারের। অন্ন তার মধ্যে নয় প্রকার। এরপর আছে ৫ প্রকার ডাল। কয়েক প্রকার সব্জি, গজা, পিঠে, পায়েস, রায়তা, খট্টা (চাটনি) ইত্যাদি। তবে মহাপ্রসাদ বলতে বোঝানো হয় অন্নপ্রসাদকে।

প্রথম অন্নভোগ হয় দুপুর দুটোয় (হওয়ার কথা সকাল ১০টায়)। জগন্নাথসহ ত্রিমূর্তিকে ভোগ নিবেদনের পর তা যায় মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বিমলা মন্দিরে। তারপর তা রূপান্তরিত হয় মহাপ্রসাদে। যায় অন্য অভিধা হল নির্মাল্য-কৈবল্য। যা মোক্ষপ্রদায়ী।

মহাপ্রসাদ তৈরির ক্ষেত্র হল প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্বদিকের পাকশালা। সকাল ৮-৩০টায় রোষ হোমের পর (অন্নপ্রস্তুতেয় হোম)। যে অগ্নি এই হোমে চয়ন করা হয়, তাকে বলা হয় বৈষ্ণব অগ্নি। যা যুগ-যুগান্ত ব্যাপী জ্বলে চলেছে। পাচকদের উপাধি এখানে সূয়ার ও মহাসূয়ায় (প্রধান পাচক)। যেহেতু দেবী লক্ষ্মী এই পাকশালার তত্ত্বাবধায়িকা, পাচকগণ নিজেদের দেবীর কিঙ্কররূপে দেখেন। সেইমতো শরীর ও মনে শুদ্ধতা রাখতে হয় তাঁদের।

মাটির চুল্লিতে ৫।৬টি হাঁড়ি স্তরে স্তরে সাজান হয়। বসান হয় ৫।৬ স্তরে এক একটি চুল্লিতে। কাঠের আগুনে বাষ্পের চাপে সিদ্ধ হয় অন্ন-ব্যাঞ্জনাদি, পাক-ক্রিয়া শেষ হলে বাহকেরা সেগুলি মুখ বেঁধে নিয়ে যায় শ্রীমন্দিরে ও ভোগমণ্ডপে। তিনজন ব্রাহ্মণ সেখানে ভোগ নিবেদন করেন। তারপর বিমলা মন্দিরের নিবেদিত প্রসাদ সেখানে যুক্ত হলে মহাপ্রসাদরূপে সেই ভোগের হাঁড়িগুলি চলে যায় ভোগবাজার আনন্দবাজারে। প্রতিদিন ৫০ থেকে লাখ টাকার মতো মহাপ্রসাদ বিক্রি হয় আনন্দবাজারে।

মহাপ্রসাদ কেন এত পবিত্র, তার সংকেত পাই পদ্মপুরাণের একটি শ্লোকে---

তত্তারণ পাচক লক্ষ্মী স্বয়ং ভোক্তা জনাইজন,
তসমাও দান বিপাশা,
দ্বৈতারাপি দুর্লভম।

আমাকে মুক্ত কর সর্ব পাপ হতে। পাবন মহাপ্রসাদ গ্রহণে। প্রস্তুত যা মহালক্ষ্মীর হস্তে। অতিদুর্লভ যা দেবতা তাদেরও কাছে।

সঞ্চয়ই বড় গুণ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেখ বাসুকি, তুমি নতুন বৌ। তোমার কাছে সব কিছুই নতুন। সংসারের অনেক কিছু ভালো লাগবে। আবার অনেক কিছু তোমার মন মতো হবে না। সংসারের সব কিছু মানিয়ে চলাটাই প্রকৃত বুদ্ধি মানের কাজ। নতুন বৌ-র প্রতি উপদেশগুলি শুধু বলার জন্য বললেন না স্বামী বিল্লুবর। এ সংসারে তাঁর অভিজ্ঞতা কম নয়। কবি হিসাবে শুধু কবিতাতে নয়, জীবনেও অনেক কিছু দেখেছেন। বুঝেছেন। বাসুকি স্বামীর কথার ওপর কোনও জবাব না দিয়ে, মাথা নীচু করে সবকিছু আত্মস্থ করলেন। যদিও সংসারের নতুন বৌ, তথাপি বাসুকি বড়ই সহজ সরল। আর পাঁচজনের মতো সে নয়। স্বামী-অন্ত প্রাণ। রাত বেশি হওয়ায়, বিল্লুবর আর কোনও কথা না বলে শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকাল সকালই বেরিয়ে পড়লেন তিনি। বাসুকি তার নিজের কাজে মন দিলেন। তিনি বরাবরই সংসারের কাজে পটু। বাপের বাড়িতেই এসব কাজের হাতে খড়ি।

দুপুরে বিল্লুবর কাজ সেরে ফিরে এলেন। খাবার খেতে খেতে নতুন বৌ-কে আবার কিছু নিয়ম-রীতি শোনাতে লাগলেন। বাসুকি, আমার যা রোজগার তাতে তোমার নিশ্চয় কোনও কষ্ট হচ্ছে না। ঈশ্বরের আশীর্বাদে ঠিক দু'বেলা কেটে যাবে। হ্যাঁ। আর একটা কথা। তুমি প্রতিদিন হাঁড়িতে চাল দেওয়ার আগে দু'মুঠো করে চাল সরিয়ে রেখো। একটা আলাদা হাঁড়িতে তা সংগ্রহ করো। সেই সঙ্গে অবসর সময়ে হাতের কাজ শিখে নাও।

বাসুকি স্বামীর কথা মতোই রোজ কিছুটা করে চাল আলাদাভাবে সরিয়ে

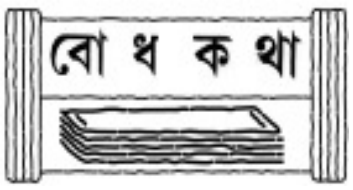

বোধ কথা

রাখতে লাগলেন। সঙ্গে হাতের কাজও শুরু করলেন। বিল্লুবর প্রতিদিনই স্ত্রীর সবকিছু খবর নিতেন। সব ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, বাড়ি ফিরেই আগে জানতেন। বাসুকি দেবী কোনওদিন অবশ্য ভুল করেননি। প্রতিদিনই চাল সংগ্রহ থেকে হাতের কাজ শেখা---- ঠিকঠাক করে গেছেন। বিল্লুবরও প্রতিদিন খোঁজখবর নিতে ভুলতেন না। বাসুকি স্বামীর আচরণে কিছুটা অবাক হতেন। মনে মনে ভাবতেন, স্বামী প্রতিদিন এক কথা কেন জিগ্যেস করেন। মনে মনে অনেক সম্ভাবনার জাল বুনলেও, বাসুকি মুখ ফুটে স্বামীকে কোনওদিন কিছু জিগ্যেস করেননি। শুধু নিজের কাজ ঠিকঠাক করে গেছেন। এভাবেই চলতে থাকে বিল্লুবরদের সংসার। বাসুকির আক্ষেপ ---শুধু নিঃসন্তান হওয়ার জন্য। ভগবান সুখ দিলেও, সন্তান সুখ দেননি। আনন্দে-নিরানন্দেই চলতে থাকল বাসুকির জীবন।

বিল্লুবর হঠাৎই একদিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে। বিল্লুবর বাসুকিকে কাছে ডেকে জানতে চাইলেন, বাসুকি, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। অনেকদিন সংসার করলাম তোমার সঙ্গে। তোমার যদি কোনও ঘটনা খারাপ লাগে তো বল। বাসুকি মাথাটা নীচু করে উত্তর বললেন, আমার অনেকদিন থেকে জানার ইচ্ছা, আপনি কেন প্রতিদিন চাল জমিয়ে রেখেছে কিনা তা দেখতেন। এর কী কারণ। বিল্লুবর বললেন, দেখ আমি চলে যাওয়ার পর তোমাকে দেখবে কে? ওই সংগ্রহ করা চাল আর তোমাকে বলা হাতের কাজই তোমাকে সারাজীবন দেখবে। কারও সামনে হাত পাততে হবে না। বাসুকিকে কোনওদিন হাতও পাততে হয়নি। স্বাভিমানের সঙ্গে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়েছেন। ঘটনাটি তামিলনাড়ুর। তামিল কবি বিল্লুবর-এর জীবনের অধ্যায়।

চিত্রকথা ।। অমর শহীদ মহান বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে ।। ৮

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর ।।
দূষণে মেদ বৃদ্ধি

শুধু ফাস্ট ফুড নয়, শিশুর দেহে মেদ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হতে পারে দূষণও। এমনটাই বলেছেন স্পেনের একদল গবেষক। এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত দূষণের জন্য মায়ের গর্ভে থাকাকালীনই শিশুর শরীরে মেদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্পেনের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, দূষিত বাতাসে এইচ সি বি বলে এক ধরনের রাসায়নিক উপাদান থাকে, যা শিশুদের মোটা হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ঘুম, আরও ঘুম

কম ঘুমোলে বেড়ে যেতে পারে সুগার লেভেল। নিউইয়র্কের বাফ্যালো ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানাচ্ছেন, যাঁরা সারাদিনে ৬ ঘণ্টার কম ঘুমোন, তাঁদের ব্লাডসুগার লেভেলে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। যা পরবর্তীকালে ডায়াবেটিসের আকার নেয়। আর যাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমোন, যাঁরা কম ঘুমোন তাঁদের তুলনায় তাঁদের ব্লাডসুগার স্বাভাবিক। ছোটদের ক্ষেত্রে না ঘুমিয়ে রাত জেগে পড়াশুনোর ফলে দেখা দিতে পারে ওবিসিটি বা স্থূলতা, ডিপ্রেশন এবং হাই ব্লাড প্রেসার। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দিতে পারে হৃদরোগ এমনকী ক্যান্সারও। কাজেই চাই ঘুম, আরও ঘুম।

উপকারি পেঁয়াজ

খাদ্য হিসেবে পেঁয়াজ কতটা উপকারি তা জানা গেল ভারত সরকারের প্রকাশিত এক হেলথ্ বুলেটিন থেকে। ১০০ গ্রাম পেঁয়াজে ভিটামিন 'এ' থাকে ২৫ ইউনিট, যা চোখের পক্ষে খুবই উপযুক্ত উপাদান। তা ছাড়া ১০০ গ্রাম পেঁয়াজ চিবিয়ে খেলে শরীরে ১৬ ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয়। পেঁয়াজ যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন 'সি' আছে বলে প্রতিদিন খাওয়ার সময় একটা গোটা পেঁয়াজ খেলে চোখের জ্যোতি বাড়ে এবং চুলেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

কলেরারোধী ধান

কলেরা রোধকারি এক ধরনের ধান আবিষ্কার করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন জাপানি বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের তরফে হিরোশি কিয়োনো বলেছেন, তাঁরা বিশেষ এক ধরনের ধানে কলেরারোধী জীবাণু প্রয়োগ করে সুফল পেয়েছেন। এর ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতে আলাদা করে কলেরার ওষুধ রপ্তানি করতে হবে না। কলেরা নিরোধক ধান চাষ করলে একই সঙ্গে দুটি কাজ হবে। প্রথমত খাবারের সঙ্কট মিটবে, দ্বিতীয়ত, জলবাহিত রোগ কলেরার সংক্রমণ থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে। ইঁদুর, গিনিপিগ জাতীয় প্রাণীর শরীরে ওই জীবাণু প্রয়োগ করে একশো ভাগ সুফল পেয়েছেন তাঁরা।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

এক ভদ্রলোক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন ঃ সেদিন যিনি আমার ছাতাটি নিয়ে চুপচাপ ট্রাম থেকে নেমে গেলেন, তাঁকে আমি চিনি। ভালো চান তো কাল সকালে নীচের ঠিকানায় আমার ছাতা ফেরৎ দিয়ে যাবেন; নইলে সকলের কাছে তাঁর নামটি ফাঁস করে দেব।

পরদিন সকালে ভদ্রলোক দেখলেন, তাঁর বাড়ির সামনে ডজনখানেক ছাতা পড়ে আছে।

☺ ☺ ☺

পিন্টু ঃ আমার ঘরের দেওয়ালে পাঁচটা টিকটিকি গান করছিল। গান শেষ হতেই বাকিগুলো দেওয়াল থেকে পড়ে গেল।

মিন্টু ঃ কেন রে?

পিন্টু ঃ গান শুনে ওরা হাততালি দিচ্ছিল যে!

☺ ☺ ☺

ক্রেতা ঃ এই কুকুরটার দাম কত?

বিক্রেতা ঃ আজ্ঞে, হাজার টাকা।

ক্রেতা ঃ বল কি হে, একেবারে হাজার? তা, বিশ্বাসী তো!

বিক্রেতা ঃ সে আর বলতে বাবু, এর আগে যতবারই ওকে বিক্রি করেছি, ততবারই পথ চিনেচিনে ঠিকই ফিরে এসেছে।

☺ ☺ ☺

পেয়িং গেস্ট-এর বিজ্ঞাপন ঃ

টি ভি গ্যাসসহ লাক্সারি ফ্ল্যাটে ছাত্রী পেয়িং গেস্ট চাই।

---টি ভি ও একটি গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে এক ছাত্রী এসে হাজির।

☺ ☺ ☺

ছবি ঃ কী রে, জোরে বৃষ্টি পড়ছে যে, ছাতাটা এবার খোল।

রুবি ঃ খেপেছিস, নতুন ছাতাটা ভিজে যাবে না!

—নীলাদ্রি

মগজ চর্চা

১। কোনও ধর্মগ্রন্থ না লিখে, মাত্র আটটি শ্লোক রচনা করে পাঁচ শতাধিক বছর ধরে বাঙালির কাছে নিত্য স্মরণীয় হয়ে আছেন কে?

২। বেন জনসনের স্বর্ণপদক কেড়ে নেওয়ার ফলে সিওল অলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক কে পান?

৩। কোন চিত্রশিল্পীর জীবন অবলম্বনে 'মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স' লেখা হয়?

৪। একটি শব্দবাজির নামে তানজানিয়ার রাজধানীর নাম। কী সেই মজার নামটি?

৫। মহাকবি কালিদাস উল্লিখিত কোন মন্দিরে মেয়েদের দেবদাসী করে রাখা হত?---পুরীর মন্দির/সোমনাথ মন্দির/উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির।

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু,
২। ক্যালভিন স্মিথ (আমেরিকা)
৩। পল গগ্যাঁ,
৪। দোদোমা (Dodoma),
৫। উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির।

পুরভোটেও ধাক্কা খাবে বামফ্রন্ট

(১ পাতার পর)

বামফ্রন্টের দখলে রয়েছে মধ্যমগ্রাম, রাজারহাট-গোপালপুর, দমদম, দক্ষিণ দমদম, মহেশতলা, রাজপুর-সোনারপুর ও উলুবেড়িয়া। এই সবগুলিতেই বিরোধী জোটের ফল ভালো হয়েছে। ফলে আদৌ বামফ্রন্ট এগুলি দখল রাখতে পারবে কিনা, এই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে।

অন্যদিকে ভোটের ফলাফল নিয়ে নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ তুঙ্গে। কোনও বড় নেতাকেই সামনে আনতে চাইছেন না তারা। অন্ধ বামভক্তদের ভোটই একমাত্র ভরসা। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বামফ্রন্ট পরিচালিত পুরবোর্ড এলাকায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভের খবর সামনে এসেছে। এমনকী ফ্রন্ট চালিত অনেক পৌরসভার কাজে খোদ পুর কর্মীরাও খুশি নন। এমনই ঘটনা দেখা গেছে বৈদ্যবাটীর পৌরসভায় (হুগলি)। পুর বোর্ড ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন ভাইস চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলার কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা নিজেরাই এর কারণে বলেছেন, "দীর্ঘদিন ধরে বৈদ্যবাটীর মানুষ জলের সঙ্কটে ভুগছেন। এই সঙ্কটপূরণে পৌরসভা ব্যর্থ।" গাছে উঠতে না উঠতেই যদি 'তাল' পড়ার ঘটনা ঘটে, তাহলে লড়াইটা হবে কীভাবে। বৈদ্যবাটীর মতো জল সঙ্কট রয়েছে আরও বেশ কিছু পৌর এলাকায়। যেখানে বামপন্থীদের হারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে শীর্ষে দমদম। এখানকার স্থানীয় মানুষও জলের অভাবে ভুগছেন দীর্ঘদিন। পৌরসভা ফ্রন্টের দখলে থাকলেও, অবস্থার উন্নতি হয়নি। বাম দুর্গের ভাঙন কিন্তু শুরু হয়েছিল পঞ্চায়েত, স্কুল কমিটি, জেলা পরিষদের নির্বাচনে। এর সবকটিতেই পযুর্দস্ত হয় বামফ্রন্ট। ২০০৩-এ যেখানে ফ্রন্ট ২৮৬টি পঞ্চায়েতের দখল নিয়েছিল, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনার পর তারা তা আর ধরে রাখতে পারেনি। নিরানব্বইটি আসন হাতছাড়া হয় ফ্রন্টের। লক্ষণীয় ঘটনা হল, নন্দীগ্রামের মাটিতে প্রধান বিরোধী দলের প্রার্থী ৪০ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। লোকসভা ভোটেও এটা বিরোধীদের দখলে গেছে। বামেদের পাটিগণিতের সব হিসাব-নিকাশ পালটে দিয়েছে বিরোধী শক্তি। এখন দেখা যাক, বামফ্রন্ট পরিচালিত কয়েকটি পৌরসভার ছবিটা কেমন।

মহেশতলা ঃ রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম পৌরসভা (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) যেখানে ১৫ বছর ধরে চলছে বামেদের বোর্ড। এবছর এখানে গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা। বস্তির উন্নয়ণে পৌরসভা কুড়ি কোটি টাকা খরচ করলেও, তাতেও দলীয় ক্যাডারদের প্রতিই বেশি আনুগত্য দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ। পানীয় জলের সমস্যাও পুরোপুরি মেটাতে পারেনি পৌরসভা। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ভোটের আগে কাজ দেখানো হচ্ছে বলে বিরোধীরা আঙুল তুলেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিয়েও বিরোধী শিবিরে একাধিক অভিযোগ। ফলে পরিস্থিতি অনেকটাই বিপরীত মেরুতে। ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে অনেক ওয়ার্ডেই স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলায় ফ্রন্ট ব্যর্থ।

উলুবেড়িয়া ঃ পৌরবোর্ডও বামপন্থীদের দখলে। কিন্তু এবারের হাওয়া বিরোধীদের পক্ষেই। বিশেষ করে তৃণমূল শিবিরে। সদ্য জেতার জয়ের উল্লাস প্রভাব ফেলতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্ডে রয়েছে গরীব মানুষের নিত্য দিনের সমস্যা। নেহরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশনের অধীনস্থ বিইউএসপি প্রকল্পে ১ থেকে ১০ নম্বর ওয়ার্ডে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হলেও, অনেক গরীবই বঞ্চিত হয়েছে। যা গরীবদরদীদের ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনতে পারে। অভিযোগ ক্যাডাররাই নাকি এর সব দেখভাল করেছে। উলুবেড়িয়ার স্টেশন রোডের অবস্থাও বেহাল। অনেক রাস্তারই ভালো করে সংস্কার হয়নি। বিদ্যুৎও পৌঁছায়নি সব ঘরে। এর ওপর রয়েছে পরিশ্রুত জলের সঙ্কট। বিরোধীদের হাতেই ক্ষমতা দিতে চাইছে এলাকার মানুষ। স্থানীয় রিক্সা চালক নিবারণ মণ্ডলও এমনই ইঙ্গিত দিলেন।

দমদম ঃ আধুনিক যানবাহনের সব ব্যবস্থাই আছে এখানে। আছে সব রুটের বাস, ট্রেন। সেই সঙ্গে রয়েছে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা মেট্রো, চক্ররেল, বিমান বন্দর। কিন্তু দমদমে পা রাখলে মনে হয় এতো মফঃস্বল। লোকসভা ভোটে বিরোধীদেরকেই সামনে এনেছে মানুষ। জয়ী করেছে। এখন পৌরসভা। হাওয়া অবশ্য বিরোধী শিবিরেই। ৮০ বছর বয়সী পৌরসভার এলাকায় উন্নয়ণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখার মতো। বামফ্রন্ট শাসিত পুরবোর্ডে এলাকার রাস্তাঘাট, জল নিকাশি, আবর্জনার মতো সমস্যায় সাধারণ মানুষও রীতিমতো ক্ষিপ্ত। এ ছাড়াও রয়েছে নিয়ন্ত্রণহীন পরিবহন, শিক্ষার উন্নয়নে বিস্তর ফাঁকফোকর। ২২টি ওয়ার্ডের মধ্যে বামফ্রন্টের রয়েছে ১৫টি। বিরোধী কংগ্রেস ৫। পুর উন্নয়ণ সংস্থার ২। এবারের ফল এখনই না বলা গেলেও, নিত্যদিনের নানান সমস্যা আর পরিশ্রুত পানীয়র অভাবই জলে ডুবাতে পারে বামপন্থীদের।

মধ্যমগ্রাম ঃ সিপিএমের অনেক নেতাই মধ্যমগ্রামের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। এমনিতেই এলাকার মানুষ পৌরসভার দায়ভার কখনও বামে, কখনও ডানকে দেয়। এবার 'বাম' হাত থেকে ডানেদের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এবার ২টি ওয়ার্ড বেড়ে হয়েছে ২৫টি ওয়ার্ড। লোকসভা নির্বাচনে ২৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল ১৯টি ও বামফ্রন্ট ৪ ওয়ার্ডে জিতেছে। এলাকায় বেশিরভাগ কাজই হয়েছে বিরোধী দলের বিধায়কদের টাকায়। পুর প্রধান মিহির দাশগুপ্ত 'পুস্তিকা' প্রকাশ করেই নিজেদের ঢোল পিটিয়েছেন।

একদিকে খেজুরি, হিঙ্গলগঞ্জ, সদ্য সংযোজন লালগড়। এরই মধ্যে পুরভোট। ফলাফল কি হবে বলা না গেলেও, পরিস্থিতি বামফ্রন্টের ক্ষেত্রে বিপরীত মেরু। একেবারে বিধি বাম।

বন্ধ হচ্ছে একের পর এক চ্যানেল

(১ পাতার পর)

পুরনো অনুষ্ঠানগুলির পুনঃসম্প্রচার করছে।

একই দশা হয়েছে তুলনায় কিছুটা নবাগত এন-ই বাংলা সংবাদ চ্যানেলের। শুরুতে এই চ্যানেলের মালিক ছিলেন সাংসদ মাতঙ্গ সিংহ এবং ধানবাদের কয়লা ব্যবসায়ী রমেশ গান্ধী। গত মে মাসে রমেশ গান্ধী চিঠি লিখে সংবাদ চ্যানেলের কর্মীদের জানিয়ে দেন যে, তিনি এন-ই বাংলা টিভি চ্যানেলের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। এই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২০০ কর্মীর ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার।

তৃতীয় একটি নবাগত বাংলা সংবাদ চ্যানেল জন্মলগ্ন থেকেই রুগ্ন। এটি হল চ্যানেল-১০। একদা কলকাতা টিভি-র অন্যতম মালিক শান্তনু ঘোষ এই চ্যানেলটির মালিক। যে কোনও কারণেই হোক, প্রথম থেকেই দর্শকের নজর কাড়তে ব্যর্থ এই চ্যানেল-১০। গত ৬ অক্টোবর ২০০৮ এই চ্যানেলটির যাত্রা শুরু হয়। সম্ভবত বৈচিত্র্যহীনতার জন্যই চ্যানেলটি জনপ্রিয়তা পাচ্ছে না। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে চ্যানেল-১০ প্রতিবেদন প্রকাশের আগেই হয়তো দরজা বন্ধ করতে পারে। প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত বছর অন্য একটি বাংলা সংবাদ চ্যানেল, 'ভয়েস অব ইণ্ডিয়া', তার সংবাদ সম্প্রচারের শুরুর আগেই দরজা বন্ধ করে। বেকার হয়ে পথে বসেন প্রায় ১০০ কর্মী।

প্রশ্ন উঠছে কেন একের পর এক বাংলা টিভি সংবাদ চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এক কথায় এর উত্তর অপেশাদারিত্ব। এইসব চ্যানেলের মালিকরা ছাঁট লোহা, কয়লা বা বাড়ির প্রমোটারিতে দক্ষ ব্যবসায়ী। কিন্তু সাংবাদিকতার কাজে পুরোপুরি অদক্ষ। তাঁরা ভেবে নেন যে চ্যানেলের দৌলতে তাঁরা মন্ত্রী -সাংসদ- বিধায়কদের ঘনিষ্ঠ হবেন এবং কাজ গোছাবেন। বাস্তবে তা সব সময় হয় না। বরং ঢাক বাজাবার খরচ যোগাতে মনসার মূর্তি বিক্রি হয়ে যায়। মালিকদের হয়তো কিছুটা আর্থিক লোকসান হয়, কিন্তু একেবারে পথে বসেন কর্মীরা। কলকাতার সমস্ত বেসরকারি সংবাদ চ্যানেলগুলি কর্মীদের অতি অল্প বেতন দেন। তাও নিয়মিত নয়। কর্মীদের পি এফ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এক কথায়, কোনও রকম সামাজিক সুরক্ষা নেই। গ্ল্যামারের টানে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা টিভি চ্যানেলে যোগ দেন। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আশাভঙ্গ। তাই কিছু টাকা থাকলেই একটা চ্যানেল খুলে মাতব্বর হয়ে বসার এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সাংবাদিক সংগঠনগুলির জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। তা না হলে নতুন নতুন চ্যানেল কিছুদিনের জন্য খুলে তরুণ প্রজন্মকে প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেল করার ব্যবস্থা আরও রমরম করে চলবে। এই বছরেই কলকাতায় দুটি নতুন বাংলা সংবাদ চ্যানেল আসছে। এদের মালিকদের সঙ্গে সাংবাদিকতার দূরতম সম্পর্ক নেই। তাই সাধু সাবধান।

চীনে সেনা বাড়াচ্ছে ভারত

(১ পাতার পর)

বলেছেন, সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার সীমান্তে অন্ততপক্ষে দুই ডিভিসন সৈন্য, গোলন্দাজ বাহিনী, চিকিৎসাব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত সহায়তা বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার। সীমানা বরাবর ভালো সড়কব্যবস্থাও একান্ত জরুরি। দ্রুত আক্রমণ মোকাবিলার জন্য সবরকমের সরঞ্জাম বৃদ্ধি হলে সেনাদেরও মনোবল বাড়বে বলে শ্রীসিং মন্তব্য করেছেন। তেজপুর বিমানঘাঁটিতে সুখেই বিমান মজুত রয়েছে, ১৫ জুনের মধ্যে বহু উদ্দেশ্যসাধক ফাইটার জেট বিমানও তেজপুর পৌঁছানোর কথা।

পরমাণু অস্ত্র বহনকারী বিমান ভারতে রাশিয়ার নকশা মতো তৈরি হচ্ছে। তাও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মোতায়েন করা হবে বলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক মুখপত্র জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, ২০০৮-এ ২৭০ বার এবং এবছরেই কমপক্ষে ৬০ বার বেআইনীভাবে সীমা অতিক্রমের ঘটনা ঘটিয়েছে চীন। ভারতের পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব সেক্টরে ঘটনা ঘটেছে।

এদিকে স্বাধীনতার ৬০ বছর পরও অরুণাচল প্রদেশের ১০৩০ কিলোমিটার সীমান্তের ৬৫০ মাইল এলাকা উন্মুক্ত। সেখানে কাঁটাতারের বেড়া পর্যন্ত নেই।

ম্যাকমোহন লাইনই ভারত-চীন সীমান্তে যুক্তিগ্রাহ্য সীমান্ত বলে চিহ্নিত যা আদতে লাইন অফ কন্ট্রোল।

সরগরম তামিল রাজনীতি

(৭ পাতার পর)

করা হোক যাতে শ্রীলঙ্কার তামিল, অভিবাসী তামিল এবং মুসলিমরা আইনের চোখে সিংহলীদের মতোই সমানিধাকার পান। বিজেপির পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিজেপি নেতা বেঙ্কাইয়া নাইডু কয়েকদিন আগেই এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, তাঁরা শ্রীলঙ্কা সরকারের কাছে দাবী জানাবেন যাতে তামিলদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।

তবে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে কমিউনিস্টরা। তামিলনাড়ুতে গতবার লোকসভায় তারা চারটে আসন জিতেছিল। এবার সংখ্যাটা দু'য়ে গিয়ে ঠেকেছে। সিপিএম একটা ও সিপিআই একটা। তামিলদের নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে জনপ্রিয়তা বাড়ানোর এমন সুযোগ কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে রাজি নয় তারা। সিপিআই নেতা আর. নাল্লাকান্নু শ্রীলঙ্কার তামিল নিধনের জন্যে দায়ী করেছে ভারত সরকার এবং তামিলনাড়ু সরকারকে! একইসঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জকে হুমকি দিচ্ছে যাতে তারা শ্রীলঙ্কার তামিলদের সুরক্ষা ও পুর্নবাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যদিও রাষ্ট্রপুঞ্জ স্বতন্ত্রভাবেই এই উদ্যোগ নিয়েছে শ্রীলঙ্কা সরকারের সব বাধাকে উপেক্ষা করে। তারপরেও কমিউনিস্টদের এ হেন বক্তব্য সস্তা গিমিকবাজি ছাড়া আর কী বা হতে পারে? কমিউনিস্টদের গতিবিধি লক্ষ্য করে রাজনৈতিক মহলের অনুমান, মুখ ও মুখোশের অন্তরালে শ্রীলঙ্কার তামিলদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ভারতবর্ষের শান্তি বিঘ্নিত করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য।

পরলোকে সবিতৃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বর্ধমান জেলার কাটোয়া শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক সবিতৃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৫ জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি স্ত্রী, চার পুত্র, এক কন্যা এবং নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন। নবদ্বীপ শাখার মূল স্বয়ংসেবক তিনি। সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে কয়েক বছর কাজ করেছেন। পরবর্তীকালে কিছুদিন কাটোয়া শাখার দায়িত্বও পালন করেন।

❁❁❁

গত ৬ জুন নাগপুরে পরলোক গমন করেছেন মনোহর রাও বখরে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। স্বাধীনতার আগে বেশ কিছুদিন কলকাতায় সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন। সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করা হয়েছে।

বাস্তব সমস্যা নিয়ে তৈরি নাটক

‘জীবনের জন্য’

দীপেন ভাদুড়ী।। বর্তমানে দারিদ্র্যের সংঘাতে জর্জর রেলের এক সাধারণ কর্মচারী জীবন দাস। বেঁচে থাকার আপ্রাণ প্রচেষ্টা তাকে অভ্যস্ত করেছে মিথ্যা ও প্রবঞ্চ নাপূর্ণ জীবন যাপনের। জীবন দাসের স্ত্রী জ্যোৎস্নার স্বপ্ন খুব অল্প। সামান্য দু'বেলা পেট ভরা ডাল-ভাতের স্বপ্ন।

আর মাথা গোঁজার আশ্রয়। নিম্নবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল মেলাতে অক্ষম জীবন দাস। চতুর্দিকে ধার এবং শোধ দিতে না পারায় তার জীবনে নিত্য জোটে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ঘরে এবং বাইরে। যদিও জীবনে ছিল মাথা গোঁজার এক দখলি অস্থায়ী আশ্রয়, রেলের জমিতে। তার জন্য গুণাগার দিতে হতো পাড়ার মাস্তানকে। সেখানেও টাকা বাকি থাকতো মাসের পর মাস। এ ধরনের টুকরো ঘটনার সমন্বয়ে এগিয়ে যায় নাটক পরিণতির দিকে।

সম্প্রতি সুজাতা সদনে “ বেলেঘাটা উত্তর পুরুষ” উপস্থাপিত করল সামাজিক সমস্যা নিয়ে একাঙ্ক নাটক “জীবনের জন্য” এবং শ্রুতি নাটক “বিষফুল”।

“জীবনের জন্য” নাটকটি লিখেছেন নটরাজ দাস। প্রয়োগে ইন্দ্র হালদার, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবহ---নারায়ণ ধর। সজ্জা---মিহির সাহা।

মাঝে মাঝে আক্ষেপের ভিতর দিয়ে জীবন দাস রসদ সংগ্রহ করে জীবনে বাঁচার, জীবনে এগিয়ে যাওয়ার। সমস্যায় জর্জরিত জীবন দাস প্রতি পদক্ষেপে সংগ্রাম করে দারিদ্র্যের সঙ্গে। পরাজয় স্বীকার করে না। শত কটুক্তি, শত লাঞ্ছনা ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। অগ্রাহ্য করে তীব্র ঘৃণা। সে জানে গরীবের বেঁচে থাকতে হলে এসব
আনুসঙ্গিক ঘটনা ঘটবেই। এসব নিয়েই জীবন। শত চেষ্টা করেও আর মুখের হাসি কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। তার নামের সার্থকতা বোধহয় এখানেই। সে জীবনের দাস।

সেজন্য নাটকে চলে আসে যে জ্যোৎস্না জীবন দাসকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে অথবা যে জীবন জ্যোৎস্নাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল, সেই জ্যোৎস্না আজ জীবনের মৃত্যু কামনা করে। এটাই বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। জীবন দাস মনে করে, সে নিজে যদি না মৃত্যু কামনা করে তাহলে কে তাকে মারতে পারবে? মাঝে মাঝে মনে হয় জীবন দাস কি সত্যিই মানুষ। সত্যিই কি বাস্তব চরিত্র? এত সহিষ্ণুতা সে অর্জন করল কোথা থেকে?

জীবন দাসের চরিত্রে কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাবলীল অভিনয় দর্শকদের ভালো লাগবে। এবং এই নাটকের একটি সম্পদ। মদনদার চরিত্রে ইন্দ্র হালদার। হিজরের চরিত্রে প্রদ্যোৎ হালদার দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম। জ্যোৎস্নার চরিত্রে সোমা সাহার অভিনয় চরিত্রের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে।

‘জীবনের জন্য’ নাটকে কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমা সাহা।

নাটকের উপস্থাপনের গুণে এবং পরিচালকের দক্ষতায় একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর নাটকের অভিনয় উপভোগ করল সেদিনের উপস্থিত দর্শকবৃন্দ।

“বিষফুল” শ্রুতি নাটকটি বর্তমান সমাজের আদর্শহীনতার জ্বলন্ত উদাহরণ। সমাজে রাজনৈতিক দলের মুখোস টেনে খুলে দিয়েছেন নাট্যকার সৌমিত্র বসু। নির্দেশনায় ছিলেন ইন্দ্র হালদার। আবহে---নারায়ণ ধর। সুজনের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শব্দরূপ - ৫১৩

মনিদীপা পাল

■	১			২	■	■	৩
৪		■	■		■	■	
■		■	■	৫	৬		
৭		৮	■	■		■	■
■	■		■	■	৯	১০	
১১			১২	■	■		■
	■	■		■	■	১৩	
	■	■	১৪				■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. পাঁচটি মুখবিশিষ্ট বলে শিবকে এই নামে ডাকা হয়, ৪. প্রতিশব্দে প্রত্যক্ষদর্শী, শেষে গোপাল দিলে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহবিশেষ, ৫. ভুবনের চতুর্থটি, স্বর্গ, দুয়ে-চারে স্বত্ব, ৭.তৎসম শব্দে যজ্ঞ, শেষ দুয়ে মজুর, ৯. অযোধ্যার নদী বিশেষ, প্রথম দুয়ে দুধের আস্তরণ, ১১. প্রতিশব্দে স্তুতিবাদ, প্রশংসাবাদ, একে-তিনে করিম ক্রিকেটার, ১৩. কুমারী কুন্তীর পুত্র, ১৪. বেহুলার স্বামী।

উপর-নীচ ঃ ১. রূপকথার ডানাওয়ালা কাল্পনিক ঘোড়া, গরুড়, ২. কাঠের পাদুকা, ৩. অজ্ঞাতবাসকালীন কনিষ্ঠ পাণ্ড ব সহদেবের নাম, ৬. সরস্বতীর বাহন, ৮. অব্যয়ে নচেৎ, নইলে, ১০. একই শব্দে সমুদ্র, রত্নের খনি, শেষ দুয়ে খাজনা, ১১. বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ, শেষ ঘরে ইঙ্গ চাবি, ১২. দইয়ের সাজা।

সমাধান শব্দরূপ ৫০১১

সঠিক উত্তরদাতা

শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।
শৌণক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭

■	ক্ষ	প	ণ	ক	■	■	ক
ত্র	পা	■	■	ঞ্জ	■	■	ণা
■	ক	■	■	য	ট্	প	দ
কৌ	র	ব	■	ঙ্কা	■	■	■
■	■	র্তি	■	■	র	ত	ন
সি	দ্ধ	কা	ম	■	■	রু	■
দ্ধা	■	■	ন্দি	■	■	ব	সু
র্থ	■	■	র	ত্না	ক	র	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১৩ জুলাই ২০০৯ সংখ্যায়।

শিল্পমঞ্জরীর রবীন্দ্র সন্ধ্যা

সংবাদদাতা।। শিল্পমঞ্জরী আর্ট ফাউন্ডেশনের নিবেদিত শিল্প ও সৃজন শিরোনামে ‘একাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এর রাণু মুখার্জি অডিটোরিয়ামে এক বিশেষ রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা-র আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী অমর পাল, আইএসএস অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আধ্যাত্ম গবেষক ভগবদ ভৌমিক প্রমুখ। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা তারকনাথ রায় অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেন। বলেন, যারা শিল্পগুণের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাদের আনন্দপ্রাপ্তি অনেক বেশি হয়। এই আনন্দ স্বর্গীয়। এর তুলনা হয় না, পার্থিব কিছুর সঙ্গে। তিনি আরও বলেন, সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, অঙ্কন ইত্যাদি শিল্পগুণ সবই অপার্থিব। এই সকল গুণের প্রকৃত অধিকারী হলেন পরম ঈশ্বর।

দুষ্কৃতীর আক্রমণে শিশুমন্দিরের ভ্যানচালক পঙ্গু

সংবাদদাতা।। গত ১০ মার্চ বেলা ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ ডোমকল থানার অন্তর্গত শ্রীপতিপুর গ্রামের যুবক ফুরকান শেখ, মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুরের চক শান্তিনগর সরস্বতী শিশু মন্দিরের নিরপরাধ ভ্যানচালক বাসুদেব মণ্ড লকে (যখন সে ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল) ধারালো হেঁসো দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে। এলোপাথাড়ি হেঁসোর আঘাতে ঘটনাস্থলেই তার বাম হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শরীরের আরও আট জায়গায় গভীর আঘাত হানে।

এই ঘটনায় বাসুদেব মণ্ড ল চিরকালের জন্য অক্ষম হয়ে পড়ল। তার চিকিৎসা ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন। সরস্বতী শিশুমন্দিরের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্বাচনী কেল্লা ফতে করার গোপন চ্যবনপ্রাশ !

শিবাজী গুপ্ত

কোনও দুর্বল ও মরণাপন্ন রোগী হঠাৎ তেজিয়ান ও বলীয়ান হয়ে উঠলে তার কারণ নির্ণয়ে চিকিৎসক মহলে সাড়া পড়ে যায়। ডাক্তার ছাত্ররা তা নিয়ে গবেষণায় মেতে ওঠে। কী ঔষধ প্রয়োগে, কোন চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বনে এমন অসাধ্যসাধন হল, তা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি চলে।

গত লোকসভা নির্বাচনে মুমূর্ষু কংগ্রেস দল এমন কী 'Elixi Vitamin-B Complex' সেবন করল যে দলটি মৃত্যুশয্যা থেকে একলাফে নতুন বাসর- শয্যায় গিয়ে বসল, তা নিয়ে আলোচনা-গবেষণা ও তর্কাতর্কির শেষ নেই। কিন্তু কংগ্রেসের গোপন রোগ নিরাময়ের জন্য দেশী গাছ-গাছড়ার সাহায্যে বেশ কিছুদিন ধরে যে গোপনে চিকিৎসা চলছিল, সে খবর মানুষ জানতে পারেনি, পারলেও তার সুদূর প্রসারী তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেনি--মুর্দাবাদকে জিন্দাবাদে পরিণত করার কৌশল বিরোধী দলগুলি করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। তাই তাদের কুপোকাৎ অবস্থা। ক্ষমতার ব্যবহার বা অপব্যবহারে দক্ষ কংগ্রেস দলের কাছে বিরোধী দলগুলি এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশুর অবস্থায়।

সরকারি অর্থাগারের টাকা জনগণের টাকা। কোনও দলের বাপের টাকা নয়। দলের স্বার্থে তার যথেচ্ছ ব্যবহার জনগণের ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। সরকারের কৃষিনীতির ব্যর্থতার জন্য চাষীরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে; কেউ কেউ হতাশায় আত্মহত্যাও করে। কৃষকদের প্রতি দরদে প্রাণ আকুল হয়ে উঠল সরকারের। তারা এককথায় ৭০ হাজার কোটি টাকার কৃষি ঋণ মকুব করে দিল। গরীব কৃষকদের ভাগ্যে ছিঁটে ফোঁটা, আর হাজার হাজার বিঘার মালিক সম্পন্ন কৃষকরাও ফাঁক তালে কোটি কোটি টাকার কৃষিঋণ শোধ করা থেকে পার পেয়ে গেল। তারা কংগ্রেস দলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় উজাড় করে ভোট দিল। ঋণ মকুবের টোটকা কংগ্রেসকে অভাবনীয় সাফল্য এনে দিল। তার বিরুদ্ধে কিছু বলার মুখই রইল না বিরোধীদের। টাকা ছড়িয়ে ভোট আদায়ের এটাও এক কৌশল বটে!

সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক সম্প্রদায় মিলে দেশে এক নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। সংখ্যায় অন্তত ১০।১২ কোটি। এরা নিজেদের Right সম্পর্কে যতটা সচেতন, Duty সম্পর্কে ততোধিক অমনোযোগী। জমিদারি তালুকদারি উচ্ছেদ হয়েছে, মহাজনী কারবার লাটে উঠেছে। এসব পরগাছা শ্রেণী কখনও রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু সরকারি কর্মচারি ও শিক্ষক সম্প্রদায় নামে নবসৃষ্ট সুবিধাভোগী সম্প্রদায় সরকারের খয়ের খাঁ-তে পরিণত হয়েছে। এরা যত চায় তত পায়। এদের হাতে রাখতে সরকার যেমন সবসময় যত্নবান, এরাও সবসময় ক্ষমতাসীন সরকারের নেকনজরে থেকে আখের গোছাতে যত্নবান। বর্তমান নির্বাচনের কয়েক মাস আগে পে-কমিশনের ধুয়া তুলে তাদের যে বেতন কাঠামো স্থির করা হয়েছে, তাতে কর্মচারি ও শিক্ষক-সম্প্রদায়ের অনেকেরই আক্কেল গুড়ুম হয়েছে। এতটা আকাশচুম্বী বেতন তারা নিজেরাও আশা করেননি। এই বেতন কাঠামোতে এক কথায় সরকারি কর্মচারিদের ঘুষ দিয়ে কার্যসিদ্ধি করা হয়েছে বলা যায়।

সাচার কমিটি মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য যেসব সুপারিশ করেছে, এবং সরকার তা কার্যকর করার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে---তা দেখে জিন্না সাহেবও কবরে পাশ ফিরে শোবে এবং কংগ্রেস দলকে মনে-মনে অনুযোগ করবে---এতই দিলদরিয়া যদি তোমরা ১৯৪৬-৪৭ সালে হতে, তাহলে তো আজ দেশভাগ ও পাকিস্তান দাবী করতামই না। ফলকথা মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব, ক্রিপস প্রস্তাব, ওয়াভেল প্রস্তাব ও মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবে যেমন কংগ্রেস দল শনৈঃ শনৈঃ দেশভাগে রাজী হয়ে হিন্দুদের অকূলে ভাসিয়ে গেল, সংখ্যালঘু তথা মুসলমানদের ক্রমাগত সুযোগ সুবিধা দান করে করে কংগ্রেস সরকার মুসলমানদের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক এবং হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত করেছে। বহুধাবিভক্ত হিন্দু ভোট সংখ্যায় গরিষ্ঠ হলেও সংখ্যাল্প অথচ একীভূত মুসলিম ভোটের কাছে পরাস্ত। কংগ্রেস দল সাচার কমিটির সুপারিশের জোরে জোটবদ্ধ মুসলিম ভোট করায়ত্ত করে দিল্লীর গদি টিকিয়ে রাখল শুধু নয়---আরও শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করল। দেশভাগের সময় জিন্নার ইচ্ছে সত্ত্বেও কংগ্রেস কেন লোকবিনিময়ে রাজী হল না শুধু মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক হাতে রাখার মতলবে, তা এবারে অক্ষরে-অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। এটাও এক ধরনের রাজনৈতিক ঘুষ বলা যায় বই কি!

কম্যুনিস্টদের পন্থা অনুসরণ করে কংগ্রেসও দল ও সরকার একাকার করে ফেলেছে। এমনকী কংগ্রেস দলের স্বার্থে সরকার সমস্ত ন্যায়নীতি যমুনার জলে বিসর্জন দিয়েছে। সরকার কি মনমোহন সিং চালাচ্ছে, না সোনিয়া গান্ধী মনমোহন সিংকে চালাচ্ছে সেটাই সন্দেহ হয়। সরকারি তহবিল থেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে সমস্ত সংবাদ মিডিয়াকে দখল করা হয়েছে। অঢেল বিজ্ঞাপনের টাকা পেয়ে সমস্ত সংবাদ মিডিয়া কংগ্রেস দলের হয়ে ঢাক বাজিয়েছে। বিজ্ঞাপন ঘুষ দিয়ে সংবাদ মিডিয়াকে করায়ত্ত করার কৌশল আর কেউ দেখাতে পারেনি। এটাও এক ধরনের ঘুষ নয় কি?

সুতরাং চাষীদের ঋণ মকুব ঘুষ, সরকারি কর্মচারি ও শিক্ষক সমাজকে বেতন বৃদ্ধির ঘুষ, মুসলমানদের সাচার কমিশন ঘুষ, সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপন ঘুষ দিয়েই কংগ্রেস দল নির্বাচনে বাজিমাৎ করেছে। যারা কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে মুখর হতে পারত, তাদের মুখে টাকার বান্ডিল গুঁজে দিয়ে বাক-স্বাধীনতার ধবজাধারীদের বাক্‌রোধ করা হয়েছে।

আর সেই ফাঁকে তলিয়ে গেছে কংগ্রেস সরকারের সমস্ত রকম আর্থিক কেলেঙ্কারি, মূল্যবৃদ্ধির যাঁতাকলে পিষ্ট সাধারণ মানুষের পরিত্রাহি চিৎকার, অনুপ্রবেশকারীদের বিনাযুদ্ধে ভারত দখলের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ এবং মুসলিম সন্ত্রাসবাদের পায়ে সরকারের নির্লজ্জআত্মসমর্পণ।

দেশবাসী corruption, infiltration, inflation ও terrorisation-এর দৌরাত্ম্যে যতই নিষ্পিষ্ট হোন, তাতে খৃস্টান ও মুসলিম জগতের সমর্থনপুষ্ট বিদেশিনী নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস সরকারের কিছু যায় আসে না। কংগ্রেসের জরাজীর্ণ দেহে নবযৌবন সঞ্চার করে নির্বাচনী কেল্লা ফতে করার এগুলিই হল গোপন চ্যবনপ্রাশ।

কংগ্রেসের উত্থানকে কি জাতীয় রাজনীতিতে দ্বি-দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা বলা ঠিক হবে?

এন সি দে

পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচন, ২০০৯ -এ বিজেপি অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী বিপর্যয় এখন সকলেরই জানা। এই নির্বাচনে বি জে পি-র বিপর্যয়কে ছোট করে দেখা বা এড়িয়ে যাওয়া কাণ্ড জ্ঞানহীনতারই পরিচয়। কারণ ১৯৯৬, ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯-এর নির্বাচনগুলিতে বিজেপির আসন সংখ্যা যেমন ক্রমান্বয়ে বেড়েছে (যথাক্রমে ১৬০, ১৭৬ ও ১৮১), কিন্তু ২০০৪ থেকে আবার কমতে শুরু করেছে। ২০০৪-এ এক ধাক্কায় আসন সংখ্যা কমে নেমে এসেছে ১৩৮;আর ২০০৯-এ আসন সংখ্যা আরও কমে দাঁড়িয়েছে ১১৬-তে।

বি জে পির এই ক্রমাবনতিতে বি জে পি এবং তার শুভানুধ্যায়ীগণ বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে না। উলটে তারা কংগ্রেসের এই অগ্রগতিতে মনে হচ্ছে খুবই উল্লসিত হয়েছে। তারা কেউ-কেউ বলছেন, এটা নাকি জাতীয় রাজনীতিতে দ্বি-দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শুভ সূচনা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এই নির্বাচনী রায় জনগণের জাতীয় বাসনার বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কংগ্রেস ২০০৪-এ পেয়েছিল ১৪৫টি আসন আর ২০০৯-এ পেয়েছে ২০৬টি আসন। অর্থাৎ কংগ্রেস ক্রমোন্নতি করে চলেছে। এটা কি জনগণের জাতীয় বাসনার বহিঃপ্রকাশ? সত্যিই কি আমাদের জনগণ সেই কংগ্রেসের উত্থান চায়, যে কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের মদতে মুসলিম কট্টর মৌলবাদী নেতাদের সঙ্গে গোপন আঁতাতে দেশকে খণ্ডিত করে ভোগ করছে। অখণ্ড ভারতের একটি অংশ চিরতরের জন্য হয়ে গেল বিশ্ব ইসলামী সন্ত্রাসবাদ রপ্তানী কেন্দ্র। আর হিন্দু প্রধান হিন্দুস্থান হয়ে রইল সকলের করিডর। পাক সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ মৃগয়া ভূমি, নিরীহ অরক্ষিত মৃতবৎ হিন্দু যাদের সহজ শিকার।

এই কংগ্রেসের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যিনি তাঁর সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের নির্দেশে এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, পরম্পরাকে ধীরে-ধীরে ধ্বংস করে পশ্চিমীদের যূপকাষ্ঠে বলি দিলেন ও যিনি জাতীয় অর্থনীতিকে কখনই শক্তিশালী আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি হিসাবে গড়ে তুললেন না।

সেই কংগ্রেসের উত্থানে কি আমরা উল্লসিত হতে পারি?

এবার দেখা যাক সত্যিই কী দেশ দ্বি-দলীয় শাসনের দিকে এগিয়ে চলেছে? তথ্য কিন্তু পরিষ্কারভাবে তা বলছে না। এবারের নির্বাচনে শতাংশের বিচারে কংগ্রেস পেয়েছে ২৮.৬ শতাংশ আর বিজেপি পেয়েছে ১৮ শতাংশ।

অর্থাৎ এই দুটি দল মিলে পেয়েছে ৪৭.৪ শতাংশ মাত্র ভোট। বাদবাকি ৫২.৯৬ শতাংশ ভোটই আঞ্চলিক দলগুলিই পেয়েছে। তা ছাড়া এমনকী এখনও অনেক রাজ্য আছে যেখানে কংগ্রেস বা বি.জে পি.-র কোনও প্রভাবই নেই। যেমন ওড়িশা, তামিলনাড়ু, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, ত্রিপুরাসহ আরও কয়েকটি রাজ্যে বি. জে. পি বা কংগ্রেস কেউই এককভাবে কখনই আর ক্ষমতায় যাওয়ার মতো অবস্থায় নেই।

আবার ভোটের শতকরা হিসাবও যদি দেখি তাহলে দেখব আরও মজার ব্যাপার। কোনও রাজ্যে ভোট কমেছে, অথচ আসন বেড়েছে এমনও আছে। কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও দেখি একই চিত্র। ওড়িশায় কংগ্রেসের ভোট কমেছে প্রায় ৮ শতাংশ অথচ আসনসংখ্যা ২ থেকে (২০০৪-এ) বেড়ে হয়েছে ৬টি (২০০৯-এ)। বি. জে.পি.-র ভোট কমেছে ২.৪ শতাংশ অথচ আসন সংখ্যা ৭ থেকে কমে হয়েছে ০।

ঝাড়খণ্ডে আবার বিপরীত চিত্র। কংগ্রেসের ভোট কমেছে মাত্র ৬.৪%, অথচ আসন কমেছে ৬ থেকে ১। আবার বি. জে.পি.-র ভোট কমেছে প্রায় ৬%, অথচ আসন ১ থেকে থেকে বেড়ে হয়েছে ৮।

এরকম বিচিত্র ব্যাপার সব রাজ্যেই ঘটেছে। কেবল বামপন্থীদের ক্ষেত্রেই সব রাজ্যেই তাদের ভোট কমেছে, আসনও কমেছে। এই নির্বাচনের রায়কে তাই জনগণের জাতীয় রায় বলে মেনে নিতে পারছি না। উল্লিখিতও হতে পারছি না দ্বি-দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এসে গেল বলে। ঋষি অরবিন্দ যেমন আমাদের স্বাধীনতাকে খণ্ডিত স্বাধীনতা বলেছিলেন, আমার মতেও এই রায় একটি খণ্ডিত রায় মাত্র। বি. জে. পি. কংগ্রেসের চেয়ে ভোট পেয়েছে ১০ শতাংশেরও কম অথচ আসন কম পেয়েছে ৯০টি।

কিন্তু যেটি চিন্তার কথা সেটি হল কংগ্রেসের ক্রমোত্থান। ২০০৪-এ যারা পেয়েছিল মাত্র ১৪৫টি আসন, এবার তারাই পেয়ে গেল ২০৬টি আসন। গতবারে বিজেপি কংগ্রেসের চেয়ে মাত্র ৪.৩% কম ভোট পেয়েছিল। এবার ভোট পার্থক্য বেড়ে হয়ে গেছে প্রায় ১০ শতাংশ। এটাই চিন্তার। কারণ দ্বি-দলীয় নয়, দেশ চলেছে কংগেসী এক দলীয় শাসনের দিকে, যে দল রয়েছে একজন বিদেশীনির হাতে। যে দল একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দুরাষ্ট্রের চরিত্রই বদলে দিতে চেয়েছিল, যে দল স্বাধীনতার পরে পরেই বৃটিশ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গ্যাটসহ সব আন্তর্জাতিক চুক্তিতেই ভারতকে যুক্ত করে দিয়েছিল। ডাংকেল চুক্তিতে সই করে দেশকে ডব্লুটিও-র গোলামে পরিণত করে দিয়েছিল। উদারিকরণ ও বিশ্বায়নের মার্কিন বিশ্বস্ত মনমোহন সিং এবারে এককভাবে বেসরকারীকরণের ডাণ্ডা ঘোরাবেন। মুসলমান ভোটারদের পরিতুষ্ট করার জন্যে সারা দেশ জুড়ে এমন এমন কাজ করবেন, যা সারা দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। এমন জাতীয় বাসনার গণরায় মোটেই অভিপ্রেত নয়।

Swastika
22 June - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

শ্রীশ্রী রাঘবেশ্বর ভারতীর হাতে মানপত্র তুলে দিচ্ছেন সুরেশ যোশী।

ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মানে ভূষিত

শ্রীশ্রী রাঘবেশ্বর ভারতী

বাসুদেব পাল।। যাঁর নামে এই প্রজ্ঞা সম্মান, সেই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার সম্পর্কে কিছু কথা পুনঃস্মরণ করার সুযোগ হয়েছে। তিনটি শব্দে ডাক্তারজীর জীবন ও কাজকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে---সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রচণ্ড আত্মত্যাগ ও জীবন লক্ষ্যে অবিচল নিষ্ঠা (conviction, dedication, mission)। প্রবল আত্মবিশ্বাস থাকার ফলেই ডাক্তারজী একাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ শুরু করেছেন। সেই কাজে নিজের জীবন সমর্পণ করেছেন। আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেই কাজেই ব্রতী থেকেছেন। অন্য কোনও দিকে তাকাননি। গত ১৩ জুন কলকাতায় কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে ২০তম ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী। প্রসঙ্গত, আর এস এস প্রতিষ্ঠাতার জন্মশতবর্ষ থেকে (১৯৮৯) প্রতিবৎসর কলকাতার প্রসিদ্ধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় এই সম্মান দিয়ে আসছে। এবার এই সম্মান প্রদান করা হয় কর্ণাটক রাজ্যের গোকর্ণ পীঠাধীশ্বর জগদ্গুরু শংকরাচার্য শ্রীশ্রী রাঘবেশ্বর ভারতী মহাস্বামীজীকে। গোরক্ষায় তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযোশী তাঁর ভাষণে আরও বলেন, সববিষয়ে পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও জীবনে নির্দিষ্ট ধ্যেয়পথে ডাক্তারজী আজীবন কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর জীবন ছিল অন্তর্বাহ্য শুচিতায় ভরা। তাঁর সুস্পষ্ট চিন্তন ছিল---হিন্দুস্থান হিন্দুদের দেশ। অন্যরা থাকতেই পারে। এটা যুক্তিতর্কের বিষয় নয়। অন্তর দিয়ে একথা অনুভব করতে হবে। তাঁর কনভিকশন এতটাই সুদৃঢ় ছিল যে স্বয়ং ভগবানও যদি বলেন, এদেশ হিন্দুরাষ্ট্র নয় তাও তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই দৃঢ় ধারণা নিয়েই তিনি সম্পূর্ণ জীবন কাজ করে গেছেন। নিজের বিচার দর্শনকে অবহেলা করেননি। আমরা বর্তমান ভারতবর্ষে যা অহরহ দেখতে পাচ্ছি---স্বার্থের কারণে আদর্শের সঙ্গে সমঝোতা। আদর্শকে বিসর্জন দিতে অনেকে পিছপা হচ্ছেন না। তাঁরা বলেন, এসব করতে হয়, পরিস্থিতিই এরকম। তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়---হিন্দু সমাজের সংগঠনই এদেশে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। নেতিবাচক ভাবনা-চিন্তার কোনও অবকাশ নেই। তিনি বলতেন, আমরা কারও বিরোধী নই। হিন্দুস্থান হিন্দুরাষ্ট্র---এটা খৃস্টান বা মুসলমানদের বোঝাতে হবে না, হিন্দুসমাজকে বোঝাতে হবে। কোনও কিছুর প্রত্যাশা না করেই কাজ করে যেতে হবে।

অথচ তিনি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন না, কালো রং, মুখে বসন্তের দাগ, বিরাট বক্তাও ছিলেন না তিনি। তবে কথার মধ্যে অন্তরের ব্যথা বোঝাতে পারতেন, অন্যের অন্তরে সঞ্চারিত করতে পারতেন। সবার জন্য বিশুদ্ধ নিষ্কাম ভালোবাসা। তার ফলে হাজারে-হাজারে মানুষ তাঁর নির্দিষ্ট পথে চলেছেন, জীবন সমর্পণ করেছেন। সংগঠনের কাজের জন্য কীভাবে নিজের মধ্যেও পরিবর্তন করতে হয় তা নিজেকে দিয়ে দেখিয়েছেন।

ভারতীয় সমাজ জীবনের সঙ্গে একাত্ম প্রাণী হল গোমাতা। কামধেনু, কল্পবৃক্ষ আমাদের কল্পনা। রাঘবেশ্বর মহাস্বামীজী একাজে নিজেকে সমর্পিত করেছেন। অনেক সময় পুরস্কার প্রাপকের কারণেও পুরস্কারের মহত্ত্ব বাড়ে। এবার তাই হয়েছে।

সম্বর্ধনা ও সম্মান জ্ঞাপনের প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রী রাঘবেশ্বর ভারতী বলেন, আমি সবে মাত্র কাজ শুরু করেছি। শাস্ত্রে বলা আছে সম্মান গ্রহণ, লোকসমক্ষে প্রদর্শন মৃত্যুবৎ। এই সম্মান আমি গোমাতার চরণে সমর্পণ করলাম। সুরেশজীর অনুরোধ আমি ফেরাতে পারিনি। গোকর্ণ পীঠাধীশ্বর আরও বলেন, ডাঃ হেডগেওয়ার একদিক দিয়ে জগদ্গুরু আদি শংকরাচার্যের সঙ্গে তুলনীয়। ডাক্তারজী স্বল্পজীবনে যে কাজ করেছেন তার তুলনা একমাত্র জগদ্গুরু আদি শংকরাচার্যের সঙ্গেই হতে পারে। ৩২ বৎসর বয়সের মধ্যে সারা দেশে ধর্মকে পুনঃসংস্থাপন করেছেন। একাধারে তিনি খণ্ডনাচার্য ও স্থাপনাচার্য। ডাক্তারজীও মাত্র

শ্রীশ্রী রাঘবেশ্বর ভারতী

১৫ বছরের মধ্যে যে কাজ করেছেন এখন আমরা তার বিশ্বব্যাপী বিরাট স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি, উপলব্ধি করছি।

রাঘবেশ্বর ভারতী মহারাজ উপস্থিত সকলকে অনুরোধ জানান এদেশে যাতে গো-হত্যা না হয় তা সকলকে দেখতে হবে।

রাজস্থান থেকে আগত সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক শংকরলাল আগরওয়াল স্বামীজী যেভাবে ভারতীয় প্রজাতির জীবিত ৩২ রকম গোরুর সংরক্ষণ করে চলেছেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ইমামি গ্রুপ অফ ইন্ড্রাস্ট্রিজের কর্ণধার রাধেশ্যাম আগরওয়াল তাঁর ভাষণে স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে কী ভাবে তিনি, তাঁর পরিবারের সকলে এবং অন্যরা অনুপ্রেরণা পান তা উল্লেখ করেন। কুমারসভা পুস্তকালয়ের কাজের সম্পর্কে অল্পকথায় জানান প্রবীন সমাজসেবী যুগলকিশোর জৈথেলিয়া, সভা পরিচালনা করেন বিমল লাট এবং ধন্যবাদ জানান মহাবীর বাজাজ। এদিন সভার শুরুতে মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি, স্বামীজী মহরাজ ও অন্যরা ডাক্তারজীর চিত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। সভাপতি রাধেশ্যামজী স্বামীজীকে মাল্যভূষিত করেন। স্বামীকে শাল দিয়ে সম্মান জানান সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণজী মোতলগ। শ্রীফল দেন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানপত্র ও ৫১ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন সরকার্যবাহ সুরেশজী যোশী।

নাগপুরে তৃতীয়বর্ষসঙ্ঘশিক্ষা শিবির সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রতিবছরের মতো এবছরও নাগপুরে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্ষ হয়ে গেল। একমাস ধরে চলা ওই প্রশিক্ষণ বর্গে সারা দেশ থেকে মোট ৯৩০ জন স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও নেপাল থেকে ৬ জন এবং ইংল্যান্ড থেকে ১ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা, গুণগত মানে ওই প্রশিক্ষণ শিবির ছিল সত্যিই অনবদ্য। আর এস এস-এর মধ্য ভারত ক্ষেত্রের কার্যবাহ মাধব বিদ্বান ছিলেন এই বর্গের কার্যবাহ। তিনি জানিয়েছেন, প্রশিক্ষণ শিবিরে ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী স্বয়ংসেবকদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

গত ১১ মে'র পুণ্যপ্রভাতে ডাক্তারজী, গুরুজীর স্মৃতিধন্য স্মৃতিমন্দিরে আনুষ্ঠানিক উদ্ঘাটন হয় শিবিরের। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের বরিষ্ঠ সদস্য মধুভাই কুলকার্ণী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন দত্তাত্রেয় হোসবোলে।

একাত্ম মানবদর্শন (Integnal Humanism)-এর বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে পাঁচটি বৌদ্ধিক অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী এই বর্গে বৌদ্ধিক দেন। এ ছাড়াও রঙ্গাহরিজী, ভাইয়াজী যোশী, দত্তাত্রেয় হোসবোলে, মদনদাসজী প্রমুখ অখিল ভারতীয় অধিকারীবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বর্তমান সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত তাঁর ভাষণে বলেন, আর এস এস তাঁর নিজস্ব ধ্যেয় অনুসারে কাজ করে চলবে। এই চলার পথে কারুর পদস্খলন হলে তার খণ্ডনের দায়িত্ব তারই। একথা তিনি স্পষ্ট করে স্মরণ করিয়ে দেন।

একমাস ধরে চলা সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ তৃতীয় বর্ষ সেবাকাজের এক অনন্য দৃষ্টান্তের সাক্ষী হয়ে রইল। সেখানে শিবিরের স্বচ্ছতার যাবতীয় দায়ভার উপস্থিত শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকরাই নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। তৃতীয় বর্ষে আরও একটি অভূতপূর্ব বিষয় হল, শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের দুটি অপরিহার্য বিষয়--- প্রাথমিক চিকিৎসা ও জৈব সার তৈরির বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

এবার পূর্ব ক্ষেত্র থেকে মোট ৫৪ জন এই বর্গে উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের ২০ জন, উত্তরবঙ্গের ১০ জন এবং ওড়িশার ২৪ জন। উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে উপস্থিত ছিলেন ৩০ জন স্বয়ংসেবক। প্রশিক্ষণ বর্গে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন কেরল থেকে---৬৪ জন। সবচেয়ে কম সংখ্যক স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিল জম্মু ও কাশ্মীর থেকে---৮ জন। এই বর্গের সর্বাধিকারী ছিলেন মীরাট প্রান্তের সঙ্ঘচালক তথা বিশিষ্ট শিল্পপতি সূর্য প্রকাশজী টোঁক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে আর এস এস-এর পক্ষ থেকে দেশজুড়ে ৫০টি প্রথম বর্ষ ও ১৩টি দ্বিতীয় বর্ষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। গত ১৮ মে এক সাংবাদিক সম্মেলন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ মনমোহন বৈদ্য জানান, প্রথম বর্ষে মোট ১৩-১৪ হাজার স্বয়ংসেবক এবং দ্বিতীয় বর্ষে মোট ৩-৪ হাজার স্বয়ংসেবক এইসব প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গত ৮ জুন নাগপুর সমারোপ উৎসবে বক্তব্য রাখেন সরসঙ্ঘচালক মোহন রাও ভাগবত। পরদিন সঙ্ঘের রীতি অনুযায়ী ভাষণ দেন তিনিই। সমারোপ কার্যক্রমে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কে টি টমাস-এর। কিন্তু তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য নিজের হাতে লেখা একটি পত্র পাঠিয়ে দেন। তাতে তিনি ভারতবর্ষের সমস্তস্তরের মানুষের কাছে আহ্বান জানান, খোলা মন নিয়ে সঙ্ঘকে বিচার করতে। এ বিষয়ে তিনি নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি একবার কেরলে একটি সংখ্যালঘুদের সেমিনারে গিয়ে অভিযোগ পান যে, এদেশে সংখ্যালঘুরা নাকি নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। তার প্রত্যুত্তরে তিনি সেই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বলেন, তিনি (কে টি টমাস) ভারতবর্ষে মোটেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন না। বরং তিনি এখানে স্বাধীনভাবেই চলতে পারেন। একইসাথে ওই চিঠিতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন, সঙ্ঘ আহ্বান করলে তিনি দক্ষিণভারতে যে কোনও অনুষ্ঠানে আসতে পারেন।

স্বস্তিকা
শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা

যে সন্ধ্যায় শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছাল তখন যে জনসমুদ্র তাঁর শেষযাত্রায় ছিল, তার তুলনা নেই। দীর্ঘ দমদম রোডের ওপর মাইলখানেক লম্বা জনস্রোত বাংলার শেষ বাঘ শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। আজও সে শ্রদ্ধা অমলিন। কমিউনিস্টদের কুৎসা, সেকুলার মতাবলম্বীদের নানা ভণ্ডামি শ্যামাপ্রসাদকে ব্রাত্য করতে পারেনি। শ্যামাপ্রসাদের আদর্শ ও মতবাদ আজও সকলের প্রয়োজনীয়। এসব নিয়েই বিশিষ্ট লেখকদের তথ্যনিষ্ঠ মননশীল রচনায় সমৃদ্ধ।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ছয় টাকা।।

আগামী ২৩ জুনের মধ্যে কপি বুক করুন, নতুবা বাড়তি কপি দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com